সাগিনা মাহাতো

গৌরকিশোর ঘোষ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মনুদ্রক : শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসনু
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রচ্ছদ : পনুর্ণেন্দনু পত্রী

প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৬০

সাগরদা'কে

এক

ব স ন্দা

যে কয় গোঁসাই আমাকে সংসার পথে হাঁটা শিখিয়েছেন, বসন্দা তাঁদের এক।

তখনো ইস্কুল ছাড়বার বয়েস হয়নি, বসন্দার সঙ্গে ভিড়ে গেলুম। ঠিক কি করে আজ আর বলতে পারব না। তবে যদ্দুর মনে পড়ে দেব্দাই ছিলেন আড়কাঠি।

দেব্দা ইস্কুলের সিনিয়ার বয়। দু'কেলাস উপরে পড়েন একে, তায় চৌকশ। খাতির আলাপ তাঁর সঙ্গে সেই জন্য সব্বার।

উনিই এক দিন যেন কি কথায় আমাকে দশের মাঝ থেকে বেছে নিয়ে একান্তে ফিসফিস করে বললেন, 'দ্যাখ, তোকে আজ যে কথা বলছি, কথা দে তা আর পাঁচকান করবিনে। তোকে সবচেয়ে বিশ্বাস করি। আশা করি, সে বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবি।'

দেব্দা দশজনের মধ্যে শুধু আমাকেই বিশ্বাস করেন, সে যে আমার কতখানি, সে কথা বোঝাই কি প্রকারে? তখন আমার বুক যদি

ফোলাবার মতো হতো, নিশ্চয়ই ফুলত। আর যদি কাবুলি বেড়াল হতুম তো তক্ষুনি সব্ব অঙ্গে রেঁায়া ফুলিয়ে দেব্দার পায়ে ম্যাঁও ম্যাঁও করে গা ঘষে বেড়াতুম। কিন্তু সে সব কিছুই করলুম না। আমি চিরকেলে নার্ভাস, আচম্কা উত্তেজনা হলে বোদা মেরে যাই।

দেব্দা বললেন, 'জানো তো আমি বিপ্লবী, আর বিপ্লবীদের বাপ-ভাই বলে কিছু নেই। সব অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কি না, ট্রেচারী করলে কটাস্ করে একটি পিস্তলের গুলি, টিপ করে একেবারে তুই ভুরুর মধ্যিখানে।'

বলেই মর্তমান কলার মতো তর্জনীখানা দিয়ে আমার তুই ভুরুর মধ্যে দিলেন এক খোঁচা। চমকে উঠলুম। মনে হলো আমি আর নেই। অসাবধানে কি এক গুপ্ত কথা ফাঁস করে দিয়েছি আর তাই আমার চরম বিচার সমাধা হয়ে গেল। কটাস্ করে পিস্তলের গুলিটা কপাল ফুঁড়ে এই মাত্তর বেরিয়ে গেল। হাত দিয়ে কপালটা দেখব রক্ত পড়ছে কি না, সেটুকু ক্ষমতাও হলো না।

দেব্দা বললেন, 'মশার পিস্তলের পাল্লা জানো? একেবারে হাজার গজ। দৌড়ে পালিয়েও নিস্তার নেই। বসন্দার কাছে তুটো পিস্তল আছে। আর বসন্দা মাছিকেও রেহাই দেন না, এমন হাতের টিপ, বুঝলে। কাজেই ট্রেচারী করতে যেও না। তোমাকে বিশ্বাস করি বলেই কথাগুলো বললাম, নইলে এসব সিক্রেট্ আউট করবার নয়।'

দেব্দা চলে গেলেন। যাবার সময় আর একবার ফিসফিস করে বললেন, 'খবর্দার, এর একটি কথা আউট হয়েছে কি—' আর মুখে বললেন না, আঙ্গুল দিয়ে পিস্তলের ট্রিগার ছোঁড়ার উদ্যোগ করেই হাঁটা দিলেন।

আমার বুকখানা প্রথম দিকে যতটা ফুলেছিল, তার দ্বিগুণ চুব্সে গেল। ভয়ে কাঠ মেরে গেলুম। বিপ্লবী সিক্রেট পেটে করে ঘুরে বেড়ানো যে কি যন্ত্রণা তা আর বোঝাই কি করে? তার উপর সদা আশঙ্কা কোন্ ফাঁকে কি বেরিয়ে পড়ে। যে শিকল দিয়ে কথাগুলিকে

জিভের সঙ্গে বেঁধেছি তার হিম্মত কত সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। রোদ লাগা পালংশাকের মতো ভয়ের তাতে চুব্‌সে উঠেছি এমন সময় দেব্দা পাকড়াও করলেন। আরেক দিন।

বাজারে যাচ্ছিলেন। আমাকে রাস্তার একপাশে টেনে নিয়ে চকিতে চারপাশ দেখে মৃতুস্বরে বললেন, 'আমাকে ফলো করো। যেন চেন না এইভাবে। জরুরী কথা আছে।'

আমি ঘেমে উঠলুম। সে দিনের পর থেকে তো রাতের ঘুম দিনের আড্ডা চুলোয় গেছে। রাতদিন কল্পনার চোখে দেখছি সরু সুতোয় ঝুলে আছি, একটু এদিক ওদিক হলেই পপাত চ মমার চ। আবার আজকে। এত লোক থাকতে দেব্দা আমাকে কেন পাকড়াও করলেন বুঝলুম না।

যা হোক, আজ্ঞা যখন হয়েছে, তখন ফলো করা ছাড়া আর কি গতি ? আমাদের পাড়া থেকে বাজার সিধে রাস্তায় বড় জোর সাত মিনিট। কিন্তু দেব্দার কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেলুম। এ-পথে ও-পথে ঘোরাঘুরি করতে করতে ঘণ্টাখানেক কাটল তবু বাজারে পৌঁছুলাম না। হঠাৎ দেখি, দেব্দা আমার পাশে এসে গেছেন।

সন্দিগ্ধভাবে ফিসফিস করে বললেন, 'ব্যাপার সুবিধের নয়। তু'জনের আর একসঙ্গে যাওয়া চলবে না। ব্যাটা পেছু নিয়েছে। তুই পোড়ামাতলা হয়ে যা, গিয়ে লক্ষ্মণ কাঁসারীর দোকানের ওখানে অন্যমনস্কতার ভাণ করে ঘোরাঘুরি করবি। আমি ব্যাটাকে নাকের জলে চোখের জলে করে তবে বাজারে যাব। যতক্ষণ না যাই দাঁড়িয়ে থাকবি। সুবিধে দেখলে কথা বলতেও পারি আবার নাও পারি। বড্ড বাঁকা পথ এটা বুঝলি।'

বলেই দেব্দা চুপ মেরে গেলেন। ব্যাপারটা কি, জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলুম। দেব্দা তাড়াতাড়ি ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে থামিয়ে দিলেন। পরমুহূর্তেই এক বৃদ্ধ আমাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন।

দেব্দা উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'ওই!' সে উত্তেজনা আমাতেও

ভর করল। দেখি কোন সময়ে আমিও চাপা স্বরে জিজ্ঞাসা করছি, 'ও কে ?'

দেব্দা বললেন, 'স্পাই।' বলেই সটকে পড়লেন।

আর কিছু জানি আর না জানি, ইংরেজী স্পাই কথাটার অর্থ জানতুম সুস্পষ্ট। দেব্দার মুখ থেকে শব্দটা শোনা ইস্তক গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠল। আর ধকাস ধকাস বুকের শব্দে কানে লাগল তালা। হাত-পা শরীরের থরথরানি কোনো রকমে সামলে লক্ষ্মণ কাঁসারির দোকানমুখো পা বাড়িয়েছি, মনে হলো পেছনে কে! চেয়েই—যা ভেবেছি—গা হাত হিম হয়ে এল। ব্যাটা আমার পিছনেও লেগেছে। অবিশ্যি লোকটা উল্টো দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু ওইটেই যে স্পাইদের কায়দা। ধরা ছোঁয়া দেবে না তো। আমিও তাই আর সিধে লক্ষ্মণ কাঁসারীর দোকানে গেলুম না। এ-পথে ও-পথে ঘণ্টা-দুয়েক ঘোরাঘুরি করে পা যখন টনটন করতে লাগল, তখন বাজার পানে মুখ ফেরালুম। ব্যাটাকে আচ্ছামতো জব্দ যে করেছি, সেই সুখের অল্প আঁচেই মনের পুলক বলক্ দিতে লাগল।

দেব্দার সঙ্গে দেখা হলো সেদিন বাজারে নয়, পরদিন ইস্কুলে, টিফিন পিরিয়ডে।

বললেন, 'ব্যাটা বড় শয়তান। বাজারই করতে দিলে না। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা তা জানিস তো, আর এই টিকটিকিতে ছুঁলে যে কত ঘা, তার ইয়ত্তা নেই। তবে আমরা রিভলিউশনারি, আমাদের কাছে ট্যাঁ ফোঁ-টি চলবে না। ওরা যদি বুনো ওল তো আমরা বাঘা তেঁতুল। নরেন গোঁসাই জেলের মধ্যে বিট্রে করে বললে, রাজসাক্ষী হব। ভাবলে জেলে যখন আছি, তখন খুব সেফ। আরে বাবা তা কি হয়। সেই জেলের মধ্যেই, বুঝলি, নরেন গোঁসাইকে খুট্‌স্।'

দেব্দা আবার আমার দিকে পিস্তল ছুঁড়ে দিলেন। কাঁদো কাঁদো হয়ে বললুম, 'কিন্তু আমি তো কাউকে কিছু বলিনি।'

দেব্দা একমুখ হেসে বললেন, 'জানি রে জানি। বসন্দা কখনো

লোক চিনতে ভুল করেননি। তোর দিকে তাঁর কড়া নজর আছে। তুই খুব লাকি। নইলে এত ছেলে থাকতে তোকেই বেছে বের করেন!'

বসন্দা কে? আমাকে চিনলেন কি করে? আবার এক ঝলক উত্তেজনা এল। শরীরের রক্ত বুড়বুড়ি ছেড়ে বেড়াতে লাগল। কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করলুম, 'বসন্দা কে?'

দেব্দা তক্ষুনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। ধমক দিয়ে বললেন, 'আমি তোমাকে চিনি তাই বেঁচে গেলে। কিন্তু খবরদার, আর কখনো এমন কৌতূহল প্রকাশ করো না। বিপ্লবীরা লাইক্ সোলজারস্। সব সময় নেতাদের কমাণ্ডে চলতে হয়। বসন্দা বলেছেন তাই তোমার সঙ্গে এতগুলো কথা বললাম। সময় হলে নিজেই জানতে পারবে। জানাবার হলে দাদাই তোমাকে জানাবেন। শুধু এটুকু শুনে রাখো, দাদার মাথার উপর সাতখানা ওয়ারেন্ট ঝুলছে। পুলিশ, স্পাই, আই বি, ইনফর্মার চতুর্দিকে দাদাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তিনি ওদের মুখে কলা ঠেকিয়ে—এই চুপ।'

বলে দেব্দা তক্ষুনি সরে পড়লেন। দেখি পণ্ডিত মশাই।

বললেন, 'কিরে কুষ্মাণ্ড, কি পরামর্শ করছিলি? অনড্ডানটাই বা পালাল কেন?'

ছ্যাঁক করে উঠল বুক। মুখ শুকিয়ে গেল। বললুম, 'স্যার, আমাদের বাড়ী আজ দেব্দার নেমন্তন্ন কিনা, তাই সে কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছিলুম।'

বলেই চোঁ-চা, দে পঁয়ষট্টি।

ছুটির পর দেব্দার সঙ্গে দেখা।

জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বললে রে বুড়ো?'

বিস্তারিত সব বললুম। চটপট বানিয়ে বলার ক্ষমতা দেখে দেব্দা খুব তুষ্ট।

বললেন, 'হবে তোর।'

আমি ফুলে উঠলুম। যে কথাটা বলবার ফুরসৎ পাচ্ছিলুম না, না বলতে পেরে আইঢাই করছিলুম, দেব্দাকে কিঞ্চিৎ প্রসন্ন দেখে সেটা বলে ফেললুম।

রাস্তার একধারে দেব্দাকে টেনে নিয়ে এদিক ওদিক চোখ বুলিয়ে ফিসফিস করে বললুম, 'কাল আমাকে ফলো করেছিল।'

দেব্দার মুখ উজ্জ্বল হলো। বললেন, 'জানতুম। আমার সঙ্গে যখনই তোকে দেখেছে, তখনই বুঝেছি তোর দফাও হয়ে এল। তা ঘাবড়াসনে। তুই এবার থেকে আমাদের নিজের লোক হয়ে যাবি।'

জিজ্ঞাসা ক'রলুম, 'বসন্দার দেখা পাব তাহলে?'

বলেই জিভ কাটলুম। জিজ্ঞাসা করাটা অন্যায় হলো। কি জানি কেন সেদিন ধমক খেলুম না।

দেব্দা বললেন, 'সময় হলেই পাবি। এখন যা। সাবধানে বাড়ী যাস।'

পাঁচ বছর ধরে যে পথ দিয়ে নির্বিঘ্নে ইস্কুল আর বাড়ী করেছি, সে পথ ছাড়তে বাধ্য হলুম। সোজা পথ ছেড়ে গলি পথ ধরলুম। কারণ বিপ্লবীদের জন্য নাকি সোজা পথ নয়। আর আমার চোখে তখন বিপ্লবের রঙ ধরে ধরে। রাস্তাঘাটে গিসগিস স্পাই দেখছি, যে পায় সেই আমায় ফলো করে। আর আমি বিকেলে ইস্কুল থেকে বেরিয়ে নানা পথ পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে সন্ধ্যেয় বাড়ী ফিরি। সদর দিয়ে আর বাড়ী ঢুকিনে, খিড়কি করেছি সার।

সে এক সাংঘাতিক অবস্থা। দিন রাত্তির যেন উত্তেজনার এক ফুলহাতা পশমের সোয়েটার গায়ে চাপিয়ে রেখেছি। ইতিমধ্যে বারকয়েক দেব্দার সঙ্গে দেখা হয়েছে। সেই রাস্তার পাশে সরে গেছি, সেই ফিসফিস আওয়াজ শুনেছি। বহু তথ্য জেনেছি। বৃটিশদের অত্যাচারের ভরা পূর্ণ হয়ে উঠেছে। পাটাতনের নিচেটায় এখন পেরেক দিয়ে টুকুস্ করে একটা ছেঁদা করার ওয়াস্তা শুধু, ব্যস্ তাহলেই বুড়বুড় করে ব্যাটাদের সাম্রাজ্য তলিয়ে যাবে। বিপ্লবীদের

উপরই এই পেরেক ঠোকবার ভার। কিন্তু বৃটিশরাও বড় হাড় হুঁশিয়ার। বিপ্লবীদের মতলব কিছু আঁচ করেছে। তাই দেশময় ঘরময় স্পাই ছড়িয়ে রেখেছে। এই স্পাইরা বড় ধুরন্ধর, শয়তানের যাশু, ট্রেচারার। ছদ্মবেশ ধরতেও অ্যাসা ওস্তাদ যে, একদিন হাতে-নাতে প্রমাণ পেয়ে অবাক হয়ে গেলুম। প্রমাণ দেব্দাই দেখালেন।

দু'জনে বেড়াচ্ছি। মিউনিসিপ্যালিটি অফিসের দিকটায় বেশ নির্জন।

হঠাৎ দেব্দা বলে উঠলেন, 'আমার চোখে ধুলো দেওয়া অত সোজা নয়। বসন্দার খাস রিক্রুট আমি। নিজে হাতে ধরে ধরে স্পাই চেনা শিখিয়েছেন। ঘাড়টা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী অ্যাঙ্গেল করে হাসপাতালের বারান্দায় তাকা। ওই যে সবুজ লুঙ্গি। দেখেছিস?'

ততদিনে কিছু কিছু তালিম রপ্ত হয়েছে। জিওমেট্রিক্যালি ঘাড় ঘোরানো বিপ্লবী বর্ণপরিচয়ের স্বরে-অ স্বরে-আ। দেব্দার সঙ্গে চারদিন ঘুরেই সেগুলো শিখে ফেলেছিলুম। কিন্তু তার পরই তিনি চুপ। হ্রস্ব-ই দীর্ঘ-ই আর কিছুতেই শেখান না। আমিও ঔৎসুক্য মুখে প্রকাশ করিনে, বিপ্লবীদের করতে নেই, কিন্তু মনে মনে অস্থিরতায় ফেটে পড়ি। কবে বসন্দাকে দেখব? কবে পিস্তল ছোঁড়া শিখব? কতদিনে আমার নামে আটখানা ওয়ারেণ্ট ঝুলবে?

সে সব কিছুই হচ্ছে না, অথচ চার মাস ধরে ফাঁকা রাস্তায় ঘুরে ঘুরে দু'পায়ে কড়া পড়ে গেল। সন্ধ্যেয় বাড়ী ফিরলে যেদিন গার্জেনের গাল-মন্দ খাই, সেদিন তবু কিছু পুলক হয়, ভাবি, বিপ্লবের দিকে কিছুটা তবু এগুলাম। প্রকৃত বিপ্লবীদের নাকি অশেষ নির্যাতন সহ্য করতে হয়, তা বাপ-মায়ের গঞ্জনাও তো নির্যাতন। দেব্দা বলেন ধৈর্য চাই। এ-পথে ফুল বিছানো নেই, শুধুই কাঁটা। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় জিজ্ঞাসা করি, তবে সাধ করে ও-পথে হাঁটা কেন? ইচ্ছে হতেই শিউরে উঠি। কিছু জিজ্ঞাসা করা চলবে না। ফক্কড় ইচ্ছেটাকে মাথায় গাঁট্টা মেরে শায়েস্তা করি।

আজ হঠাৎ দেব্দার কথায় কিঞ্চিৎ চাঙ্গা হয়ে উঠলুম। উৎসাহটা পোষা কুকুরের মতো পাপোশের উপর পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিল, এখন মনিবের শিস্ শুনে ঘুম ভেঙ্গে সামনে দু'পা এগিয়ে একটা ডন্ মেরে দাঁড়ালে।

দেব্দা বললেন, 'দেখলি ?'

দেখলুম সবুজ লুঙ্গি পরা একটা মড়ুঞ্চে ঢ্যাঙ্গা লোক সত্যি সত্যিই সেই হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কি কথা বলছে।

দেব্দা বললেন, 'ডাক্তারটা ইনফর্মার, ভাল করে চিনে রাখ। স্পাইটা ওর কাছ থেকে যাবতীয় খবর নিয়ে থানায় দিয়ে আসে। আজ তো ব্যাটাচ্ছেলে লুঙ্গি পরেছে, সেদিন দেখি হাফপ্যান্ট পরে থানার সামনেকার খাবারের দোকানে বসে বসে তেলেভাজা খাচ্ছে। এই লোকটা ভেক ধরতে পয়লা নম্বর। সবচেয়ে বেশী খবর এ-ই সাপ্লাই করে। কিন্তু যতই ভেক ধরো আমাদের চোখ এড়ানো তোমার বাপেরও কর্ম নয়। বসন্দাও এর ওপর কড়া নজর রেখেছেন।'

তারপর দেব্দা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। ধীরে ভারি গলায় বললেন, 'হু নোজ, হি মে বি আওয়ার ফার্স্ট টার্গেট। (কে জানে, এই হয়তো আমাদের পয়লা বলি হবে)।'

তারপর সুর পালটে শুধুলেন, 'কি, পকেটে পয়সা-টয়সা কিছু আছে ?'

খাতা পেন্সিল কেনবার জন্য কয়েক আনা পকেটের তলে পড়ে ছিল। অঙ্কের খাতা ফুরিয়ে গেছে বেশ ক'দিন। বড় মণিবাবুর গাঁট্টা আর কানমলা খাচ্ছি সমানে। বাবার কাছে বিস্তর দরবার করে তবে আজ কয়েক আনা পয়সা আদায় করেছি। আমার বাবা গোঁড়া সোস্যালিস্ট। ছেলের লেখাপড়ার পিছনে অন্ প্রিন্সিপল্ গাঁটের পয়সা খরচ করতে চান না। বলেন, এসব স্টেটের দায়িত্ব! স্টেট যদি না দেখে তবে তার সিটিজেন মুখ্খু হয়ে থাকবে, আমার কি ?

অবশ্যিই বাবার কিছু না, কারণ বাবাকে বড় মণিবাবুর ক্লাস করতে হয় না। আর বড় মণিবাবু কট্টর আঙ্কিক। দুই আর দুই-এ বিয়োগ করলে গোল্লা, যোগ করলে চার, ভাগ করলে এক, গুণ করলে চার। এর ব্যতিক্রম পাটিগণিতে নেই। তেমনি খাতা না থাকলে হোম্ টাস্ক করা যায় না। আর হোম্ টাস্ক না দেখালে রেহাই পাওয়া বড় মণিবাবুর চাঁটিগণিতেও নেই। তাই কানের দায়ে তদ্বির করে যে পয়সা আদায় করেছি, সে সম্পর্কে অন্যকে ওয়াকিবহাল করতে মন বড়ই বেজার হলো। কিন্তু দেব্দা জিজ্ঞাসা করেছেন, জবাব দেব না, বিপ্লবের এমন খেলাপ আমি নই।

বললুম 'আছে কিছু।'

দেব্দা বললেন, 'গুড, চল তাহলে তোকে সঙ্গে করেই নিয়ে যাই।'

দু'জনে থানার সামনেকার দোকানে গেলুম। আমার চোখের উপর দিয়ে একটির পর একটি পয়সা তেলেভাজায় পরিণত হলো। তার কিছুটা দেব্দার আর কিছুটা আমার পেটে গিয়ে জায়গা নিলে। মনে করতে চেষ্টা করলুম ইস্কুল বলে কোনো বস্তুর সঙ্গে কখনো আমার মোলাকাত হয়নি।

আধ ঘণ্টা কাটল। খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে বাইরে বেঞ্চিতে চুপ করে বসে আছি। সামনেই থানার গেট। গেটের ডানপাশে এক ঝাঁকড়া বটবৃক্ষ, তার নিচে জটাই শিবের মন্দির। সন্ধ্যে হয়ে এল। চুপচাপ বসে আছি কেন কে জানে? এই নিশ্চল নিশ্চুপ মুহূর্তে এলোমেলো চিন্তাগুলো বাসায় ফেরা কাকের মতো ঝটপট ঝটপট করে যেন এ ওকে ঠেলে দিয়ে আমার মনে জায়গা নিতে চায়। ভাঙা ভাঙা কত চিন্তা যে আসে, মিলিয়ে যায়, ঠিক নেই।

একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলুম, দেব্দা কনুয়ের ধাক্কা দিয়ে সজাগ করিয়ে বললেন, 'এসে গেছে।'

এদিক ওদিক চাইছি। দেব্দা বললেন, 'শিব মন্দিরে।'

দেখলুম এক মোটা বেঁটে আধবয়সী স্ত্রীলোক শিবকে প্রণাম করে

এক ঘটি গঙ্গাজল রেখে বেরিয়ে গেল।

চাপা উত্তেজনায় বললুম, 'ও কে?'

দেব্দা মৃদু হাসলেন। আত্মকৃতিত্বের কড়া পাকে সে হাসি বাঁধা। বললেন, 'সেই সবুজ লুঙ্গি। খবর রেখে গেল।'

আমাকে কে যেন দু'হাতে তোল্লা করে হাইশট্ মেরে আকাশে ছুঁড়ে দিলে, সেখান থেকে রিটার্ণ শটে আবার মাটিতে। সে কী! সবুজ লুঙ্গি ছিল হিলহিলে রোগা, পাকা ছ'ফুট মাথায়। আর এই স্ত্রীলোকটি লম্বায় সাড়ে চার ফুট হয় কিনা সন্দেহ, কিন্তু সে ঘাটতি আড়ে' পুষিয়ে নিয়েছে। দু'হাতেও বেড় পাব না নির্ঘাত। দেব্দা না থাকলে আমার সাধ্যও ছিল না সনাক্ত করি। বলিহারী চোখ দেব্দার, বড় সাফ নিরিখ, এ না হলে বিপ্লবী!

দেব্দা বললেন, 'হাঁ হয়ে গেলি যে, বৃটিশ স্পাইদের এ ক্ষমতার তারিফ করতেই হয়। মেক্ আপ্‌টা শিখেছিল বটে, তবে টেররিস্টদের মধ্যেও দু-একজন যা আছে না, সে আরও তাজ্জব। চিটাগাং আর্মারী রেডের এক নেতা, একবার ইওরোপীয়ান লেডির ছদ্মবেশে পালাচ্ছিলেন। ময়মনসিংহের এক পুলিশ অফিসার সন্দেহ করে তাঁকে ধরলে, কিন্তু ভাই সে যা মেক্ আপ্ একখানা করেছিলেন তিনি, ডাক্তারী পরীক্ষাতেও ধরা পড়লেন না। এসব ক্ষমতা বিপ্লবী ছাড়া আর কারো নেই। বসন্দাও দারুণ মেক্ আপ্ নিতে পারে। এখন বাড়ী যা। শনিবার ছুটির পরে আমার বাড়ী যাস, তোর রক্তমন্ত্রে দীক্ষা হবে।'

রক্তমন্ত্রে দীক্ষিত হলাম। আমার ব্যাপ্‌টিজম হলো বিপ্লবে। আর কি? বসন্দার দেখা এবারে পাবই। যার সম্পর্কে এক বছর ধরে নানা কথা শুনে আসছি, সেই বিপ্লবী গুরুর সঙ্গে মুখোমুখি আমার দেখা হবে! শহরে এত ছেলে থাকতে শুধু আমারই সঙ্গে, এত ভাগ্য আমার! আবার দুরু দুরু ভয়ে হৃদয় কাঁপে। কি জানি কবে কি

করে ফেলি আর বিপ্লবীর পিস্তলে নরেন গোঁসাই হয়ে যাই। আমার কপাল যে নিপাট ভাল নয়, দীক্ষা নেবার দিনই টের পেলুম। নিয়ম হচ্ছে লাল কালীতে লেখা এক প্রতিজ্ঞাপত্রের নিচে আঙ্গুলের রক্তে দস্তখত করতে হয়। প্রতিজ্ঞাপত্রে সই দেবার সময় আর আঙ্গুল থেকে রক্ত বের হলো না। কত টেপাটেপি, দেব্দা তো স্ূঁচ ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে তাবৎ আঙ্গুল ঝাঁজরা করে দিলেন। কিন্তু কোথায় রক্ত? গত বছর থেকে ম্যালেরিয়ায় ভুগছিলুম, সব রক্ত তাতেই সাবাড় হয়ে গেছে।

হাল ছেড়ে দেব্দা বললেন, 'কুছ পরোয়া নেই, আমার ব্লাড্ প্রেসার, দেদার বাড়তি রক্ত আছে, আয় আমার রক্তেই তোর উজ্জীবন করি।'

তাই হলো। তাজা বিপ্লবীর রক্ত দিয়েই গোটা গোটা অক্ষরে নাম লিখে দিলুম। প্রতিজ্ঞাপত্রে কি লেখা ছিল সেটা ইচ্ছা করেই চেপে যাচ্ছি। ও সিক্রেট আউট করবার নয়। বিপ্লবী দাদারা এখনো বেঁচে। কোন সময় ঝড়াক করে নরেন গোঁসাই করে বসেন, কি জানি।

দীক্ষা চুকলে দেব্দা বললেন, 'ব্যস্, এবার তুইও পাক্কা রিভলিউশনারি। বি প্রাউড অব ছ্যাট্। চল আজ সন্ধ্যেয় বসন্দার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিই!'

ইস্টিমারে চড়েছেন? ইঞ্জিনঘর দেখেছেন? হঠাৎ সারেঙ ঘন্টি মারে আর খালাসী কি কল টিপে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে কলঘরে ধকড়-ধাই ইঞ্জিন চলতে শুরু করে আর গোটা ইস্টিমারখানা কাঁপতে থাকে থরথর! আমার অবস্থা হলো তাই। দেব্দার মুখে কথাটা শুনেই বুক ইস্টিমারের কলঘর হয়ে উঠল। বুকের পিটুনী কিছুতেই থামে না। বসন্দাকে দেখব? আজই?

গুটি গুটি দু'জনে বের হলাম। এ-পথ ও-পথ ঘুরে যথারীতি এক বাসার সামনে এসে দাঁড়ালুম। একতলা বাড়ী, অন্ধকার অন্ধকার। উঠোনটা রাস্তা থেকে নিচু। এর আগে বিপ্লবী বলতে এক দেব্দাকেই

যা দেখেছি। দেব্দারা ডাকসাঁইটে জমিদার। বিরাট বাড়ী, বিরাট কম্পাউণ্ড। ভেবেছিলুম এই বোধ হয় বিপ্লবীদের নমুনা। দেব্দারই যদি এই হয় বসন্দার না জানি কত বড় বাড়ীই হবে। আমাদের শহরে পোদ্দার বাড়ীটাই সব থেকে বিরাট। ওরা সবাই আবার কমুনিস্ট। মনে মনে আঁচ করে নিয়েছিলুম বসন্দারটাও ওই কছমের কিছু একটা হবে। কিন্তু দেব্দা যখন ফিসফিস করে বললেন, 'এইটেই বসন্দার বাড়ী', তখন মনে হতাশার একটা ধাক্কা লাগবে লাগবে, এমন সময় তার চেয়েও একটা বড় ধাক্কা খেলুম। দড়াম করে সদরটা খুলে গেল, আর 'বাপ' বলে এক চীৎকার দিয়ে একটা ছেলে হাত ডলতে ডলতে সিধে দিলে দৌড়।

ছেলেটিকে চিনলুম। ন্যাড়া সিংগি। কুস্তির আখড়া আছে। বেজায় গায়ে জোর। তবে সেই বা এখানে কেন? আর ওভাবে বাপ বাপ বলে পালালই বা কেন? এইমত ভাবছি, আরেকজন বেরিয়ে এল।

বিরক্ত হয়ে দেব্দাকে বলে উঠল, 'দেখলি বসন্দার কাণ্ড। কত কষ্টে ছোড়াটাকে ভজালুম, আর দিলে ভাগিয়ে। কুস্তিটুস্তি করে শুনে খুশি হয়ে হ্যাণ্ডসেক্ করতে গেছেন, আর গেছে ছোড়াটার হাত ভেঙ্গে। আর কোনোদিন ও এ-পথে পা বাড়াবে ভেবেছ!'

বুঝলুম আচমকা এই ব্যাপারে দেব্দা কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়েছেন। একান্তে টেনে নিয়ে গিয়ে চাপাস্বরে লোকটাকে কি যেন বললেন।

লোকটি জোরে জোরেই জবাব দিলে, 'রেখে দে তোর নতুন রিক্রুট। ন্যায্য কথা বলতে শর্মা কখনো পেছ-পা নয়। তোমাদের মতো ভোঁতা বিপ্লবীদের গুজুর গুজুর আমি বরদাস্ত করতে পারিনে। দু'একজনে কিস্সু করতে পারবে না, ম্যাস্ রিভলিউশন চাই। কাল কলকাতায় যাচ্ছি, পার্টি ফর্ম করা যায় কিনা দেখে আসি। বসন্দাও পলিসি চেঞ্জ করতে রাজী আছেন। মার্ক্স্ পড়, বুঝলি, ফুসুর ফুসুর ছাড়।'

লোকটা কে রে বাবা! বলিহারি বুকের পাটা তো! এক বাঘা

বিপ্লবীর বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে পাড়া জানিয়ে কথা কইছে। খেলে বুঝি এক পিস্তলের গুলি। যা ভেবেছি তাই। দেব্দা পেট কোঁচড়ে হাত ঢোকাচ্ছেন। যদিও সঠিক জানতুম না, তবু আমার কেমন ধারণা ছিল ওইটেই পিস্তল রাখবার গুপ্ত জায়গা। পাঁচকড়ি দে'র বইতেই বোধহয় পড়েছিলুম। ভয়ে তক্ষুনি চোখ বুঁজতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু আর বুঁজতে হলো না। ফাঁড়া কাটল খুব জোর। পিস্তল নয়, দেব্দা পেটটা চুলকালেন। লোকটি গট গট করে চলে গেল।

দেব্দা বললেন, 'এস্‌কেপিস্ট্।'

দেব্দা তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'বসন্দার কাছে দাঁড়ানো অত সোজা নয়। কি রে, ঘাবড়ে যাসনি তো।'

সে কথা আর বলতে! তবু মুখে তেজ দেখিয়ে বললুম, 'না না।' কিন্তু দেব্দার আওয়াজে আগের মতো রহস্য খুঁজে পেলুম না। কেন জানিনে লোকটার মুখ থেকে ভোঁতা বিপ্লবী কথাটা শোনা ইস্তক অনেক ভয় অনেক দুর্ভাবনা আমার কেটে যাচ্ছিল। সব সময় এরা পিস্তল নিয়ে ঘোরে না, চট করে তা দুম্ করে ছুঁড়েও দেয় না, এটা দেখেও আশ্বস্ত হলাম।

বসন্দার সঙ্গে মুখোমুখি হবার জন্য যখন তৈরী হলাম তখন আমি অনেক স্বাভাবিক, দেব্দার দেখানো জুজুর ভয় অনেক কেটে গেছে।

আধো আলো আধো অন্ধকারে বসন্দাকে দেখলুম। কোনটা বেশী বিরাট, সামনে যে বসে আছে, না দেয়ালে যে ছায়াটা পড়েছে, ঠিক ঠাহর করতে পারলুম না। ওই ছোট্ট স্বল্পপরিসর ঘরে তাঁর বিশাল শাল্মলী তরুবৎ চেহারাটা যেন ধরছিল না। এ যেন চায়ের পিরিচে রাখা রোস্ট্ করা এক রাজহাঁস।

ফিসফিস করে কার সঙ্গে কথা কইছিলেন। আমি থরথর করে কাঁপছিলুম। দরজার বাইরে খোলামেলায় যে ভয়টা হাতছাড়া হয়েছিল, এই রহস্যময় আলো-আধারের পুরীতে তা আবার ঘাড়ে চেপে বসল।

সমস্ত ঘরে একটামাত্র আলো। আলোটা বসন্দার মুখের কাছে। দেব্দা আলোর কাছে গিয়ে ঠোঁট নেড়ে কি যেন বললেন, বসন্দা ফিসফিস করে কি জবাব দিলেন।

দেব্দা আমায় ডাকলেন, 'এগিয়ে এস, বসন্দা তোমায় ডাকছেন।'

উত্তেজনায় আমি তখন ফেটে পড়ছি। নিজের উপর কোনো শাসন আমার আর তখন নেই। আমি তখন বনবন করে ঘুরপাক খাচ্ছি। লাট্টু বনে গেছি। দেব্দার হাতে লেত্তি, আমাকে ইচ্ছেমতো ঘোরাচ্ছেন।

বসন্দার কাছে এগিয়ে গেলুম।

বললেন, 'বোস।'

গলার স্বর চাপা অথচ কর্কশ। তারপর আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে, গর্দান ধরে, গুলো টিপে খানিকক্ষণ দেখলেন, খাসি পাঁটা কেনবার আগে যে কায়দায় দেখে নেওয়া হয় অনেকটা তেমনি করে। তারপর একটু যেন মনঃক্ষুণ্ণ হলেন, একটু যেন করুণা মিশিয়ে নিলেন গলার স্বরে।

রায় দিলেন, 'বড়ই নরম। বিপ্লব দেখবি, এই হাত ত্থাখ।'

পদ্মপাতার মতো এক গব্দা তেলো আমার সামনে এগিয়ে দিলেন।

বললেন, 'রাখ, হাত রাখ।'

হাতের মায়া ছেড়ে দিলুম। চোখের সামনে কুস্তিগির ন্যাড়ার যন্ত্রণাকাতর পলায়নপর চেহারাটা ভেসে উঠল। আলগোছে হাত-খানা বসন্দার হাতে চিরদিনের মতো উইল করে দিলুম।

বসন্দা হেসে বললেন, 'উঁহুঁ, টেপ, টিপে ত্থাখ।'

হাতখানা ওঁর হাতের উপর দিয়ে একবার শুধু টেনে নিয়ে গেলুম। নতুন ছাদের মতো তাতে ধার। বসন্দা হো হো করে হেসে উঠলেন।

বললেন, 'বিপ্লব করবি, শরীরটা এমনি কর।'

বলেই বসন্দা উঠে পড়লেন। দরজার পাশ থেকে দরজায় লাগাবার মোটা একটা শালকাঠের খিল তুলে আনলেন। এক হাতে

তার এক কোণা ধরে আরেক হাতের এক কলি মেরে মড়াৎ করে সেখানা ভেঙ্গে ফেলে বললেন, 'কি রে, পারবি বিপ্লব করতে?' বলেই আবার দমকে দমকে হাসি। আমার আমপিত্তি ওখেনেই জমে গেল। কথা আর বলব কি?

সেই থেকে আমি বসন্দার চেলা। নিজে হাতে ধরে ধরে আমাকে কাজ শিখিয়েছেন। কি করে যে তাঁর নেকনজরে পড়লুম তা জানিনে, তবে সেই নেকনজরের ধাক্কা সামাল দিয়েও যে টিকে আছি তা সেরেফ পাকা গাঁথুনির জোরে।

তবে একটা জিনিসের আস্বাদ আর পেলাম না। কোনোদিনই না। সেই মশার পিস্তল দুটোর। না সে দুটোর গায়ে হাত ঠেকালুম, না একটিবার চাক্ষুষ করলুম। আমিও চেলা বনলুম আর দাদারাও আণ্ডারগ্রাউণ্ড থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সেই লোকটিরই জয় হলো। কলকাতা থেকে ফিরে এসে প্রকাশ্যে রাজনীতি করবার এক দল বানালে। বসন্দা প্রেসিডেন্ট, তিনি সেক্রেটারী, দেব্দা-টেব্দা সব একজিকুটিব আর আমরা সব অর্ডিনারী মেম্বর। র‍্যাঙ্ক অ্যাণ্ড ফাইল। ওরা হুকুম করবেন, আর আমরা 'জী কমরেড' বলে তক্ষুনি তামিল করব—এ আইনটা এখনো রয়ে গেল। মাথা খাটাবার দায়টা দাদাদের হাতে বন্ধক দিয়ে প্রেমসে পলিটিক্সে নামলুম।

হুকুম হলো 'মাস কনটাক্‌টের'। মানে জনসংযোগের। বসন্দা নিজেই নেতৃত্ব নিলেন। দল বেঁধে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে লাগলুম। কিন্তু তারা কাজের লোক। শহরের বাবুদের কথা শোনবার মতো ফালতু সময় তাদের কোথায়? খুব মুশকিল। লোক না জুটলে বক্তৃতা হবে কি করে?

বসন্দা বললেন, 'এভাবে হবে না। কুচকাওয়াজ করে যেতে হবে।'

ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়ে গেল। একটা বিউগল, একটা

কিটল ড্রাম যোগাড় হলো। লাল শালু কেটে বড় পতাকা তৈরী হলো। তারপর শুরু হলো গ্রাম অভিযান। শহরের সীমানার বাইরে গিয়ে বসন্দা কমাণ্ডার বনে যেতেন। তিনি একটা মোটা লাঠি হাতে সব্বার আগে, তারপর পতাকাবাহী দেব্দা, তারপর সেক্রেটারী শিবুদা, তারপর আরো কারা কারা, তারপর বিউগল হাতে একজন আর সব্বার শেষে ড্রাম ঘাড়ে আমি।

দৃশ্যটা চোখ বুঁজলে এখনো ভেসে ওঠে। ঝড় নেই বৃষ্টি নেই, আমরা লম্বা সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। বসন্দা হুকুম দিলেন, 'বাদ্য'। অমনি ভোঁপপো ভোঁপপো বিউগল আর কুড়ু কুড়ু ড্রাম বেজে উঠল। আমরা উত্তেজিত হয়ে উঠলুম। ফের বসন্দার হুকুম হলো, 'মার্চ, লেফট্ রাইট লেফট্।' কদমে কদমে এগিয়ে যেতে লাগলুম। একটু এদিক ওদিক হবার জো ছিল না। কে জানে ওই মোটা লাঠি কার পিঠে টিপ করে পড়বে। মার্চ করা দেখে বসন্দা খুব খুশি। এবার তাঁর শেষ হুকুম, 'সঙ্গীত'। সঙ্গে সঙ্গে আবার মার্চিং সঙ্ গাইতে শুরু করলুম, অমল ধবল পালে লেগেছে (লেফট্ রাইট লেফট্, পা মিলিয়ে নেওয়াও হচ্ছে) মন্দ মধুর হাওয়া।'

একদিন পড়ন্ত বিকেলে মাঠের মধ্য দিয়ে সবাই চলেছি। অপূর্ব কোরাসে মার্চিং সঙ্খানা গাইতে গাইতে মনের পুলক দু'পাখা মেলে উড়ে চলেছিল, ধীরে ধীরে সে পাখা গুটিয়ে আনতে লাগল। কি ব্যাপার? সামনে পড়েছে একপাল মহিষ। ইয়া তাগড়াই তাগড়াই শিঙ। দু-একটা আবার সন্দেহজনকভাবে চেয়ে দেখছেও। বসন্দার কি? কানেও শোনেন না, চোখেও ভাল দেখেন না, তিনি তো গটগটিয়ে ওদের মধ্য দিয়েই দিব্যি পথ করে বেরিয়ে গেলেন। এখন আমরা? কখন না জানি দেব্দা লাল ফ্ল্যাগ গুটিয়ে পকেটে ফেলেছে। লাল দেখলেই মহিষের রাগ খামাকা চড়ে যায়। দেব্দা তো সেফসাইডে দাঁড়াবার বন্দোবস্ত করলেন। এখন আমি? আমার ড্রামের পেটটাও তো টকটকে লাল, ওটা তো আর ভাঁজ করে পকেটে

পোরা যাবে না। তার উপায় কি? মনের জাঁতায় এসব ভাবনা পিষছি। ওদিকে দাদাদের শলাপরামর্শ জোর চলেছে এগুনো উচিত কি না। আমাদের শিব্দা ছিলেন মোষোলজিস্ট, একবার দুধের ব্যবসা করেছিলেন কিছুদিন, তাইতে তিনি নাকি মহিষদের সাইকোলজি বিলক্ষণ স্টাডি করেছেন।

আমায় বললেন, 'দু' পা এগিয়ে বেশ ঠাহর করে ছাখ দিকিনি মোষটা কোন চোখ দিয়ে চাইছে। যদি ডান চোখ হয়, তো কোনো ভয় নেই। যদি বাঁ চোখে চায় তবেই মুশকিল।'

মহিষদের ডান বাঁ ঠিক করা বড় গোলমেলে, হাত নেই কিনা। কিন্তু সে কথা খোলসা করে বলব দাদাদের, এমন তালিম পাইনি। অর্ডার ইজ্ অর্ডার। প্রাণটাকে আরেকজনের কাছে জিম্মা রেখে দু' কদম এগিয়েছি এমন সময় হু-উ-উ-স্। বাপরে কি গজরানি। পিছু ফিরে দেখি সেরেফ ফাঁকা ময়দান। জনপ্রাণী যে কোনোদিন সে পথে হেঁটেছিল তার কোনো প্রমাণই নেই। চোখ বুঁজে দিলুম এক দিকে দৌড়। কিন্তু মহিষের সঙ্গে পারব কেন? বাঁ দিকে দেখলুম একটা গর্ত মতন, পা দুটো সেদিকে বাড়িয়েছি কি, গর্তের ভেতর থেকে কে গর্জন করে উঠল, এদিকে নয় স্টুপিড্, একার জন্য সবাই মরবে দেখছি, অন্যধারে যাও। বিনা বাক্যে তাই করলুম। তখন আমার এমন অবস্থা যে মহিষটা যদি বলত, 'দাঁড়াও বাছা, তোমার পেটে একটা ঢুঁ মারব, আর ছুটতে পারছিনে' তো নিশ্চয়ই তাই করতুম।

হঠাৎ দেখি বসন্দা। বাঘের মতো লাফিয়ে পড়লে আমার আর মহিষটার মাঝখানে। তারপর চকিতে দুটো দৃশ্য দেখলুম। বসন্দার হাতের চিরসঙ্গী মোটা লাঠিটা উঠল আর তারপর মহিষটা মুখ গুঁজে সেই মাঠেই গড়িয়ে পড়ল।

আমি তখন থথর করে কাঁপছি। বসন্দা এগিয়ে এসে পিঠের উপর খসখসে হাতটা রাখতেই ড্রামসুদ্ধ তাঁকে দুই হাতে জড়িয়ে

ধরলুম।

হেসে বললেন, 'ভয় পেয়েছিস? তুই না বিপ্লবী?'

সেই দুটি কথায় ভয় কোথায় পালাল। মুহূর্ত পরেই দু'পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ালুম।

দাদারা একে একে এলেন।

দেব্দা বললেন, 'তোর এখনো নার্ভ শক্ত হয়নি। সহজেই পাজল্ হয়ে যাস।'

পার্টি বেড়ে উঠল। দেব্দা, শিব্দা আর বসন্দা 'হোল টাইম ওয়ার্কার' হয়ে গেলেন। দেব্দার জমিদারি আছে, শিব্দার টুইশানি। তাঁদের তত ভাবনা নেই। বসন্দা কখনো এখানে খান কখনো ওখানে। আমাদের শহর থেকে মাইল আষ্টেক দূরে সদরে বসন্দার এক দাদা ছিলেন, উকিল; অন্য কোথাও না জুটলে সেখানে গিয়েও খেতেন।

একদিন গল্পগুজব করছি, জ্যৈষ্ঠ মাসের দিন, বারোটা বেজে গেছে।

বসন্দা বললেন, 'গোরে, দ্যাখ তো তোর বাপ ফিরেছে নাকি? ফিরে থাকলে চট করে সাইকেলটা নিয়ে আসবি।' বাড়ী গেলুম। সাইকেলটা বসন্দার হাতে এনে দিতেই বললেন, 'এই আসছি, খেয়ে আসি, তোর বাপ ঘুম থেকে ওঠবার আগেই এনে দেব সাইকেল।'

বসন্দা সেই যে গেলেন, সন্ধ্যে গড়িয়ে গেল, তবু ফিরলেন না। বাবা ডাক্তার। গ্রামেই তাঁর রোগী। সাইকেল ছাড়া একদণ্ডও তাঁর চলে না। সেদিন সাইকেল না পেয়ে রেগে কাঁই। বাবার অনেকদিন থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল, আমি খারাপ লোকের পাল্লায় পড়েছি, সেদিন তিনি একেবারে নিঃসন্দেহ হলেন। ভাবলেন, হয়তো তাঁর সাইকেল বেচে আমি বদকর্ম করেছি। বেধড়ক ঠ্যাঙানি দিয়ে ঘরে দরজা বন্ধ করে রেখেছিলেন। চরিত্র শুদ্ধির এর থেকে বড়

দাওয়াই আমাদের বাপেদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে আর কিছু নেই। আমার জ্বর এল কাঁপিয়ে। অনেক রাত্রে চারিদিক যখন থমথমে তখন আমার সমস্ত আচ্ছন্নতা ভেদ করে সাইকেলের ঘন্টি বেজে উঠল। তারপর দরজায় পড়ল চিরপরিচিত টোকা। যে টোকা শুনে রাত্রে ঘর ছেড়ে কতদিন নিঃশব্দে বেরিয়ে গেছি বসন্দার সঙ্গে। রেল লাইন ধরে ধরে মাইলের পর মাইল হেঁটেছি। কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, কোনো প্রশ্ন কখনো করিনি। করলেও জবাব পেতুম না। বসন্দার সেই এক হুকুম, 'চ ওয়ার্ক করে আসি।' শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, জল নেই, রোদ নেই, সেই একই কথা, 'চ ওয়ার্ক করে আসি।' জানি কোনো ওয়ার্কই হবে না, একটি লোকের সঙ্গে দেখা হবে না, কারো সঙ্গে একটি কথা হবে না, শুধু মাইলের পর মাইল হাঁটা, শুধু হয়রানি। তবু সেই ফ্যাসফেসে চাপা কর্কশ গলার অমোঘ আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করবার সাধ্য ছিল না।

হয়তো ইস্কুল থেকে বেরুচ্ছি—গেটের বাইরে দেখি বসন্দা। বুঝলুম বারোটা বেজে গেল। নিয়তির মতো বসন্দার হাতে সঁপে দিলুম নিজেকে।

বললেন, 'গোরে, চ' দিকি শান্তিপুর, একটা কনট্যাক্ট করে আসি।'

মিনমিন করে বললুম, 'একবার বাড়ী গেলে হতো না, বই-টইগুলো রাখতুম, একটু জলটল মুখে দিয়ে—'

বসন্দার দিকে চাইলুম। শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'বেশ, তবে এখন গেলে ট্রেনে করে যেতে পারতিস, তা না হয় হেঁটেই যাবখন।'

শান্তিপুরে পৌছলাম যখন, তখন সন্ধ্যে। খেয়া, ট্রেন সব 'ফিরি'তে এসেছি। বসন্দার সবকিছুতেই 'ফিরি পাশ'। সঙ্গে থাকলে আমাদেরও। স্টেশন থেকে শহর মাইল দেড়েক। হাঁটতে শুরু করলুম।

বসন্দা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি রে, খুব খিদে পেয়েছে?'

আমার মাথায় চড়াক করে রক্ত উঠে গেল। সকাল সেই নটা সাড়ে নটায় তুটো নাকেমুখে গুঁজে ইস্কুলে গিয়েছি। সারাদিন মাস্টার মশাইয়ের শারীরিক শক্তির পরীক্ষা নিয়ে এমনিতেই নেতিয়ে পড়ার অবস্থা, তার উপরে বসন্দার পাল্লায়। বাড়ীর পাওনা তো আর মনে করতেই সাহস হচ্ছিল না।

জবাব দিলুম না। দিলেও শুনতে পেতেন না। যৌবনকালে জেলে জেলে কাটিয়েছেন। অকথ্য অত্যাচার তাঁর উপরে হয়েছে। ফলে চোখের জ্যোতি নিষ্প্রভ হয়েছে, আর বধিরতা কানের মধ্যে পাকাপাকি বাসা বেঁধেছে। মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে কথা বলতে হয়। ঠোঁটের কম্পন দেখে তিনি কথা বুঝে নিতেন।

আমার সঙ্গে বসন্দার যখন ঘনিষ্ঠতা হলো তখন তাঁর পঞ্চাশের উপর বয়স। তবু কি স্বাস্থ্য, কি আসুরিক শক্তি! বসন্দার চেহারা যখনই মনে পড়ে, দেখতে পাই তাঁর সেই ঋজু দীর্ঘ দেহ, তাঁর মতোই মজবুত এক লাঠি হাতে, আর গায়ে রঙ-ওঠা এক গেরুয়া পাঞ্জাবি হাঁটু অবধি ঝোলা। সেই পাঞ্জাবির পকেট তুটো স্পেশ্যাল ফরমায়েসে তৈরী। কোমর থেকে শুরু করে হাঁটু বরাবর ছিল সে পকেট তুটোর খোল। ডবল বেডের তোষকটা শুধু ঢুকত না, তা ছাড়া আর সমুদয় দ্রব্যই বোধ হয় সেখানে এঁটে যেত।

বসন্দা সেই পকেট হাতড়ে একখণ্ড হত্তুকি বের করে বললেন, 'খা। তেষ্টা পাবে না।'

তাই মুখে পুরলুম। ওটা না পেলে রাস্তার খোয়া তুলেই চুষতুম, আমার তখন এমন অবস্থা।

বসন্দা বললেন, 'লোকটা ভাল। খুব খাওয়াবে দেখিস!'

সেই আশাটুকুই প্রাণে জল এনে দিলে। তখন অন্ধকার ঘোর হয়েছে। হাঁটছি তো হাঁটছিই। শান্তিপুরের পাড়া বেশ দূর দূর। বার কয়েক ঘোরাঘুরি করলুম। বসন্দার মুখে কোনো কথা নেই। মাঝে মাঝে তু-একটা বাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়ান।

বেশ করে দেখেন, তারপর জিজ্ঞাসা করেন, 'গোরে, ভাখ তো এই বাড়ীটা কিনা ?'

এ তো আচ্ছা ফ্যাসাদ ! জীবনে এই প্রথম এলাম এখানে। কার বাড়ীতে এসেছি তাও জানিনে, আমি কি করে বলব ? এবার সত্যি সত্যি রাগ হতে লাগল।

হঠাৎ একটা বাড়ীর সামনে গিয়ে বসন্দা বললেন, 'পেয়েছি।'

তার পরেই ডাক দিলেন, মানে হাঁক দিলেন, 'নিবারণ বাড়ী আছ ? নিবারণ !'

কেউ সাড়া দেয় না। বসন্দা বার কতক হাঁকাহাঁকি করে বিরক্ত হয়ে বললেন, 'গোরে, একটু এগিয়ে ভাখ না।'

দরজার কাছে গিয়ে শিকল নেড়ে ডাক দিলুম, 'নিবারণবাবু !'

এক ছোট্টো খুকি বেরিয়ে এল। জিজ্ঞাসা করলুম, 'নিবারণবাবু তোমার কে হন ?'

বললে, 'দাহু।'

বললুম, 'যাও, তাঁকে পাঠিয়ে দাও।'

খুকি চলে গেল। খানিক বাদে বেরিয়ে এল এক বছর সতেরোর ছেলে।

জিজ্ঞাসা করলে, 'কাকে চাই ?'

বললুম, 'নিবারণবাবুকে। বলুন বসন্দা এসেছেন।'

ছেলেটি একটুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাইলে। তারপর বললে, 'বাবা তো মারা গেছেন।'

যেন এক আছাড় খেলুম। বললুম, 'সে কী। কবে ?'

ছেলেটি অবাক হয়ে বললে, 'জানেন না ! সে তো বছর আষ্টেক হবে।'

লজ্জায় মরে যাই। ছেলেটির দিকে আর চাইতে পারলুম না। হন্ হন্ করে ঘাড় গুঁজে এগিয়ে চললুম। বসন্দা 'কি রে, এই গোরে, কি বললে ?' বলতে বলতে আমার পিছনে আসতে লাগলেন।

রাস্তার একটা আলোর কাছে এগিয়ে ঠোঁট নেড়ে নেড়ে বললাম. 'মারা গেছেন নিবারণবাবু।'

বসন্দা হঠাৎ নিবারণবাবুর উপর খাপ্পা হয়ে উঠলেন। রাগে গর্‌গর্‌ করে বললেন, 'মরে গেল ! তা আমাকে একবার বললে না। রি-অ্যাক্‌শনারি কোথাকার। চ ফিরে যাই, এখানে জলস্পর্শ করব না, বরং আয় জল ত্যাগ করে যাই।'

বলেই রাস্তার পাশে বসে গেলেন।

স্টেশনে এসে শুনি শেষ ট্রেন ঘণ্টাখানেক আগে চলে গেছে। এবার সারারাত ধরে আঙ্গুল চোষো আর মশা মারো। পরদিন পরীক্ষা। তা হয়ে গেল। বাড়ীর বাইরে রাত কাটিয়েছি, ব্যস্‌ জন্মের মতো বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক চুকল। ক্ষিধে, দুশ্চিন্তা আর মশার যুগপৎ আক্রমণের মুখে আমি তখন অভিমন্যু। শেষ ঘা দিলেন বসন্দা।

বললেন, 'চ গোয়াড়ী যাই। এইতো কাছেই, ঘণ্টাখানেক লাগবে বড় জোর।'

কার মুখ দেখে আজ সকালে উঠেছিলুম রে ! উপায় নেই। সেই অন্ধকারেই হাঁটা দিলুম। কিছুদূর হাঁটতেই মনে হলো, অন্ধকারে ভুল করে আর কারো পা পরে বেরিয়ে এসেছি। নইলে এত ভারী পা আমার হয় কি করে ? হাঁটছি তো হাঁটছিই। হঠাৎ পেটের মধ্যে এক জোর মোচড় মারল, সমস্ত দুনিয়া উপর নীচ হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে পাথরে ঠোকর খেয়ে মুখ গুঁজে পথের উপর পড়ে গেলুম। কোন এক তমিস্রার মধ্যে তলিয়ে যেতে লাগলুম। ডুবকে ডুবতে মনে হলো, ডুবছি না তো, হাওয়ায় ভাসছি, হাওয়া কেটে উড়ে চলেছি।

চোখ মেলতে দেখি স্বপ্ন নয়, সত্যিই শূন্য দিয়ে চলেছি। নড়তে-চড়তেই বসন্দা কাঁধ থেকে নামালেন।

সস্নেহে বললেন, 'ওই ছাখ গোয়াড়ীর আলো। চ, ওখানে

আমরা খেয়ে নেবখন। কি, এটুকু হাঁটতে পারবি ?'

পাঁচ ছ' মাইল পথ বসন্দার কাঁধে কাঁধে পার হলাম। বিস্ময়ে বাক্ সরল না। খোঁড়াতে খোঁড়াতে গোয়াড়ী পৌছলাম। এক হোটেলে ধারে খেয়ে বাড়ীমুখো রওনা যখন দিলুম, তখন রাত একটা। আর হেঁটে নয়, সেদিক পানে মাল বোঝাই গরুর গাড়ী যাচ্ছিল এক সার। তারই একটায় দু'জনে উঠে শুয়ে পড়লুম।

আমার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে সস্নেহে বসন্দা বললেন, 'খুব কষ্ট হয়েছে, না রে ?'

সেই স্নেহকরস্পর্শে সমস্ত বেদনা, সব কষ্ট উপে গিয়ে দুটি বিন্দু অশ্রুর অর্ঘ্য নিঃশব্দে আমার চক্ষু বেয়ে বসন্দার উদ্দেশ্যে ঝরে পড়ল।

বসন্দার সেই খসখসে চাপা কর্কশ স্বর অন্ধকারে গরুর গাড়ীর ক্যাঁচক্যাঁচানিকে দু'হাতে সরিয়ে বেজে উঠল।

বললেন, 'এমন করেই তো শক্ত হয়ে উঠবি। শক্ত না হলে বিপ্লব করবি কি করে ? বালির বস্তা কাঁধে করে কাদার মধ্য দিয়ে আমাদের ছুটতে হতো !'

বসন্দার কাছে বিপ্লব মানে গায়ের জোরের প্রদর্শনী। হাল রাজনীতিতে তার স্থান কোথায় ? প্রকাশ্য রাজনীতিতে বিপ্লবের অর্থ অন্য। গণ-আন্দোলন চাই। জনসাধারণ জাগ্রত হলে ওদের দিয়ে বিপ্লব করাতে হবে। হাতের জোরের স্থান নেই, এখানে শুধু মুখের জোর। গরম গরম বক্তৃতায় লোককে চাগিয়ে তুলতে হবে। এই পার্টিতে বসন্দার জায়গা কই ? যে বসন্দা হাতে ধরে ধরে এক একজনকে রিক্রুট করেছেন, আজ তারাই প্রধান, বসন্দা একপাশে। আজকের পার্টিতে বসন্দার মূল্য ছেঁড়া মাদুরের মতো।

বসন্দা এখনো প্রেসিডেন্ট। তবে শুধু নামে। দেব্দাই এখন সর্বেসর্বা। কারণ দেব্দা খুব সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারেন। সে জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনলে রোমাঞ্চ হয়, রক্তে বলক্ কাটতে থাকে, উন্মাদনা সর্ব শরীরে ভুর্ ভুর্ করে। যেমনটি হতো অনেক অনেক

দিন আগে, যখন সবাই শহরের বাইরে গিয়ে লাইন ধরে দাঁড়াতুম বসন্দার নেতৃত্বে, একটার পর একটা কড়া কর্কশ কণ্ঠের হুকুম শুনতুম, 'বাস্ত। মার্চ, লেফট্ রাইট্ লেফট্। সঙ্গীত।'

সে রাজনীতি এ রাজনীতি নয়। সেদিনের বীরত্ব আজ বোকামো। এখন 'স্ট্রেংথ্' নয়, 'ট্যাক্ট'। শুধু বুদ্ধির অসৎ প্যাঁচ আর কুটিল কৌশল। পথ যাই হোক, উদ্দেশ্যসিদ্ধি চরম কাম্য।

এখান থেকে বসন্দা হটে যেতে বাধ্য, গেলেনও। এ তাঁর ভাল লাগে না। পার্টি একজিকুটিভে শিব্দা প্রস্তাব আনলেন, বসন্দাকে প্রেসিডেণ্ট পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক। দেব্দা দেখলেন, শিব্দার মতলব খারাপ। বসন্দার পর শিব্দাই সিনিয়ার, তাঁরই প্রেসিডেণ্ট হবার তাক।

দেব্দা বললেন, 'থাক-না বুড়োটা। ওঁর নামে তবু কিছু ছেলে জুটছে। বাদ তো যখন-তখন দিলেই হলো।'

কথাটা কি করে বসন্দার কানে গেল। তিনি দিন কয়েক গুম মেরে রইলেন।

একদিন অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। জেগেই বুঝলুম বসন্দা। সেই চাপা স্বরে ডাক, 'গোরে।'

উঠলুম। দরজা খুলতেই বসন্দা বললেন, 'জামা গায়ে দিয়ে আয়। কথা আছে।'

গঙ্গার ধারে এসে বসলুম। সেদিন পূর্ণিমা। রাত গড়িয়ে এসেছে। হাওয়া উঠছে। মনে পড়ল অনেক দিন আগে এমনি গভীর রাতে গরুর গাড়ীতে চড়ে বসন্দার সঙ্গে আসছিলাম।

বসন্দা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। কি একটা বলি বলি করছেন। কিন্তু দুরন্ত এক চাপা অভিমান তা কিছুতেই প্রকাশ করতে দিচ্ছে না।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকবার পর শেষে বললেন, 'আমাকে এরা তাড়াতে চাইছে, শুনেছিস! বলেছে নাকি আমি কোনো কাজের

নই। বক্তৃতা দিতে পারিনে কিনা, তাই কোনো কাজের নয় বলে দিলে। শিবে এসে দেবার কথা লাগিয়ে গেল, আবার দেবা এসে শিবের কথা লাগালে। এই তো ওদের কাজ। অথচ ওই দুটোকেই আমি হাতে করে মানুষ করেছি। সে যাক, কিন্তু আমি বক্তৃতা দেব ঠিক করেছি। ওরা ভাবে আমি তা পারিনে। কিন্তু আমি পারি। পুলিশের গুলি খেয়ে পদ্মা সাঁতরে পার হয়েছি। এই ছাখ সে গুলির দাগ।

বসন্দার সে কী উত্তেজনা! পড় পড় করে কাঁধের জামা ছিঁড়ে বুলেটের দাগ দেখালেন।

'উরোতে গুলি খেয়েও পাঁচিল টপকে জেল পালিয়েছি, এই ছাখ।' একটানে কাপড় খুলে কুঁচকির পাশে চোটের চিহ্ন দেখালেন।

'গোড়ালীতে এই দাগ ছাখ। দু'দিন হেঁটমুণ্ডে ঝুলিয়ে রেখেছিল। একটা কথা মুখ দিয়ে বের করে নিতে পারেনি। ক'টা চ্যাংড়া নাবালক আজ আমাকে বলে, কোনো কাজের নই। বক্তৃতাই যদি কাজ হয়, বক্তৃতাই দেব।'

বসন্দাকে এত উত্তেজিত আর কখনো দেখিনি। বসন্দার এই রূপও আর কখনো দেখিনি। এ বসন্দা দৈনন্দিনের নন, খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এলেন, সেই পুরানো যুগের বসন্দা। লোকের মুখে মুখে কিংবদন্তীর ঘোড়া দাবড়িয়ে যিনি ফেরেন, সেই বসন্দা।

বসন্দা আবার ঝিম মেরে রইলেন। তারপর অভ্যস্ত মৃদু শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'তুই আমাকে গোটাকতক কথার মানে বলে দে দিকি। ওরা কথায় কথায় যেগুলো বক্তৃতায় লাগায়। রুশ, ম্যাস, লেনিন—বল তো এগুলো কি? এরা কারা?'

সেই রাতে গঙ্গার চরায় বসে বসে বসন্দাকে আধুনিক বিপ্লবী রাজনীতির বহু ব্যবহৃত শব্দগুলো কণ্ঠস্থ করিয়ে দিলুম।

এই প্রথমবার আমাদের পার্টির 'স্ট্রেংথ্ মোবিলাইজ্' করা হবে প্রকাশ্যে। শহরের কেন্দ্রস্থলে বিরাট জনসমাবেশ হবে। 'মে দিবসের' জনসভা। আমি ছিলুম পার্টির পোস্টার ইনচার্জ। শহর পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে দিয়েছি। খুশি হয়ে পার্টি এক্‌জিকুটিভ্ আমাকে 'অর্ডার অব পোস্টার'-এ ভূষিত করলে। আমার প্রমোশন হলো। এবার হলুম 'স্লোগান ইনচার্জ'। জিগীরের পয়লা আওয়াজ আমার, তারপর অন্য সবার। কারা যেন সমানে আমাদের পোস্টার ছিঁড়ে দিচ্ছে। অদৃশ্য শত্রুর আক্রমণে আমরা ঘায়েল হয়ে পড়লুম। পার্টি এক্‌জিকুটিভ্ দেব্দাকে সব পাওয়ার দিয়ে দিলে। জেনারেলিশিমো দেব্দা 'মার্শাল ল' জারি করে দিলেন। প্রত্যেকটি সভ্য এক একটা নির্দিষ্ট এলাকায় চব্বিশ ঘণ্টা পোস্টার পাহারা দেবে। দেব্দা নিজে ঘুরে ঘুরে তদারক করবেন। শহরের কেন্দ্রস্থলের পাহারা দেবার ভার পড়ল বসন্দার উপর।

যেদিন সভা তার আগের দিন বিকালে দেব্দা এসে ফেটে পড়লেন পার্টি অফিসে। শোনা গেল বসন্দা ট্রেচারী করেছেন। কি ব্যাপার? না, বসন্দাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে মিটিং-এর জায়গার পোস্টার ফেস্টুন সব ছেঁড়া। এ লোকের কড়া শাস্তি দরকার। রাশিয়া হলে এ অপরাধে চরম দণ্ডই দেওয়া হতো। সেটা পারা গেল না রাজ্যটা তখনো ইম্পিরিয়ালিস্টদের কব্জায় বলে। তবে এটা স্থির হলো, এখন চুপচাপ থাকো, মিটিংটা চুকে যাক, তারপর অতর্কিতে একদিন জেনারেল মিটিং ডেকে বসন্দাকে দাও তাড়িয়ে।

কিন্তু বসন্দা গেলেন কোথায়? হঠাৎ আমার খেয়াল হলো, বাড়ীতে নেই তো? ছুটলুম সেখানে। যা ভেবেছি তাই, বসন্দা ঘরে দরজা দিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। অনেক কষ্টে দরজায় ধাক্কা মেরে বসন্দাকে বের করে আনলুম।

শিশুর মতো একগাল হেসে বললেন, 'প্রায় হয়ে এসেছে, বুঝলি।

কাল দেখবি, একেবারে ফাটিয়ে দেবো।'

বললুম, 'এদিকে যে দফা শেষ। আপনার এলাকায় পোস্টার ফেস্টুন একটাও নেই, সব ছিঁড়ে দিয়েছে।'

বসন্দা গর্জন করে উঠলেন, 'কে ছিঁড়েছে ?'

বললুম, 'তা কি জানি ?'

বসন্দা বললেন, 'তুই যা, আমি দেখছি।'

বসন্দা বেরিয়ে গেলেন। আমিও পার্টি অফিসে এসে বসলুম। ঘণ্টাখানেক বাদে দেখি 'আলট্রা কম্যুনিস্ট' বলাই কুণ্ডু হন্তদন্ত হয়ে আসছেন। মোটাসোটা মানুষটি এককালে বসন্দার সাগরেদ ছিলেন। 'আলট্রা' হওয়া ইস্তক ওঁর ওপর তাঁর বেজায় আক্রোশ।

বলাই কুণ্ডু বললেন, 'হ্যাঁ ভাই, আমি তোমাদের পোস্টার কেন ছিঁড়ব ?'

আমরা তো অবাক।

'সে কথা কে বললে ?'

বলাই কুণ্ডু বললেন, 'বসন্দা। আমাকে বাজারে চেপে ধরে বললেন, তোরা কি ভেবেছিস আমি মরে গেছি ? আমার পার্টির পোস্টার ছিঁড়িস তোর এত বড় বুকের পাটা। এক আফশানে আলুর দম করে দেব জানিস—বল দিকি ভাই, পাঁচজনের সামনে কি অপমান !'

'না না, সে কী কথা ! ছি ছি। বসন্দা ভুল করেছেন—'

বলতে না বলতেই বসন্দা হাজির। অফিসে ঢুকেই বললেন, 'সব ঠিক করে দিয়েছি।'

দেব্দা বললেন, 'আপনি বলাইদাকে খামাকা বকেছেন কেন ? উনি তো ছেঁড়েননি পোস্টার।'

বলাই কুণ্ডুও সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি ছিঁড়তে যাব কেন ?'

বসন্দার নজর এতক্ষণে তাঁর উপর পড়ল। বললেন, 'বলছিস তুই ছিঁড়িসনি !'

বলাই কুণ্ডু বললেন, 'এই আপনার গা ছুঁয়ে বলতে পারি।'

বসন্দা কিছুক্ষণ গুম মেরে রইলেন। তারপর বললেন, 'বেশ কথা। তবে তুই বসে বসে আমাদের পোস্টার পাহারা দে। যদি একটাও কেউ ছেঁড়ে তো আমি তোকে ছিঁড়ব।' তারপর দেব্দাকে বললেন, 'কাল আমিও বক্তৃতা দেব। এখন যাচ্ছি।'

ওরা অনেক চেষ্টা করেও বসন্দাকে থামাতে পারল না। তাই ঠিক হলো বসন্দাকে সভাপতির আসন দেওয়া হবে। তারপর যা বক্তব্য দেব্দা শিব্দা সব বলে যাবেন। সবার শেষে উঠে সভাপতির বক্তৃতায় বসন্দা যা খুশি তাই করুন।

সভায় লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। দেব্দা বললেনও বটে। ভাবের আবেগে অতগুলো লোককে কখনো উত্তেজিত, কখনো শান্ত করে, কখনো রাগিয়ে, কখনো হাসিয়ে তাঁর বক্তৃতা শেষ হলো। হাততালিতে কান ফেটে গেল আমাদের। এর পর ভাল জমবে না বলে শিব্দা নমো নমো করে গোটা কতক প্রস্তাব পেশ করেই ছেড়ে দিলে।

সব শেষে বসন্দা উঠলেন। দেখলুম তাঁর মুখ শুকনো, থরথর করে সর্ব দেহ কাঁপছে। কথা বলতে চেষ্টা করছেন, আওয়াজ বেরুচ্ছে না। একটা গোটা মিনিট যে অতক্ষণ সময়, তা আগে জানতুম না। যে সভা এতক্ষণ নিরেট সময়ের মতো স্তব্ধ ছিল, সূঁচ পড়লে আওয়াজ শোনা যেত, সে সভায় গুঞ্জন শুরু হলো। অবশেষে দেখলুম বসন্দা সর্বশক্তি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। কী কর্কশ আওয়াজ!

'কমরেস্, বন্ধুগণ···রুশ বলে এক দেশ আছে, সেখানে যত অত্যাচারিত নিপীড়িত নির্যাতিত শোষিত জনগণ, ম্যাস, যত কৃষক যত মজুর তারা সব···তারা সব একত্র হয়ে, সে যাক···কমরেস, আজ আমাদের এই দুর্দিনে যখন খেতে পাইনে, পরতে পাইনে তখন যত অত্যাচারী শোষণকারী নিপীড়নকারী পুঁজিপতি তারা সব, সে যাক···কমরেস, মহামতি লেলিন রুশদেশে এক প্রকাণ্ড বিপ্লব করে

রেভলিউশন করে···সে যাক···'

এমনি একটার পর একটা 'সে যাকে'র চোটে মিটিং ভেঙে খানখান হয়ে গেল। গোলমাল হৈ চৈ চীৎকার শেয়াল-কুকুরের ডাকে সভাস্থল ভরে উঠল। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে বসন্দার কর্কশ অনুনয় আমার কানে এসে ঘুরে ঘুরে বাজতে লাগল।

'কমরেস, কেউ যাবেন না, আমার বক্তৃতা শেষ না হলে কেউ যাবেন না, আরো আছে, অনেক কথা বলবার আছে।'

আবার দর্শকদের হুঁ-উ-উ হাঁ-আ-আ শব্দে সে কথা ডুবে যাচ্ছে। আবার বসন্দার চীৎকার উপরে উঠছে, 'রুশ লেনিন, ম্যাস জনগণ এই তো, সবই তো বলছি, চুপ করুন, শুনুন।'

ভিড় ঠেলে বসন্দার কাছে এগিয়ে যেতে যেতেই ফাঁকা হয়ে গেল। বসন্দা একবার আমার দিকে চাইলেন। উত্তেজনায় থরথর কাঁপছে তাঁর সমগ্র দেহ, গলগল করে ঘামছেন, মুখের দু' কসে ফেনা। মনে হলো যেন বৃদ্ধ উচ্চৈঃশ্রবা। প্রাণপণ চেষ্টা করেও কাদায় পড়া রথটাকে টেনে তুলতে পারলেন না। অপমানে, গ্লানিতে, ব্যর্থতায় হতাশায় মুখখানা কালো করে প্লাটফর্ম থেকে নেমে শ্লথ পায়ে বিপর্যস্ত বিরাট দেহটার অনাবশ্যক ভার টেনে টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে চোখের আড়ালে চলে গেলেন।

পরদিন ভোরে আমার ঘরের দরজায় দেখি একটা খাম। বসন্দার নিজ হাতে লেখা পদত্যাগপত্র। বসন্দাকে আর কোনো-দিন আমাদের পার্টি অফিসে দেখিনি।

বসন্দা নেই, কিন্তু বসন্দার বক্তৃতাটি আমাদের পার্টি যতদিন ছিল রয়ে গিয়েছিল। দেবদা সেটা চমৎকার ভেঙ্গাতে পারতেন। যখনই আমাদের অবসর বিনোদনের দরকার হতো দেবদা সেই বক্তৃতা ভেঙ্গিয়ে আমাদের আনন্দ দিতেন।

শুনে শুনে আমিও শিখেছিলুম, তবে অত ভাল পারিনে।

দুই

দিন্দা

সামান্য ব্যাপার থেকে সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেল। আমি কিন্তু সাতেও ছিলুম না পাঁচেও না। ইস্কুলে আমার ছিল হাফ-ফ্রি-শিপ। তাই ভয়ে ভয়ে থাকতুম। কাজেই গণ্ডগোলটা পাকিয়ে উঠছে দেখেও যেন দেখিনি, এইভাবেই কাটাচ্ছিলুম।

কিন্তু দৈব আমার প্রতিকূল। আমাকে বিপাকে জড়িয়ে ছাড়লে।

সেদিন যথারীতি ক্লাসে গিয়েছি। রজনী বেয়ারা একটা চিরকুট নিয়ে ক্লাসে এসে ঢুকল। বড় মণিবাবু বিজ্ঞান পড়াচ্ছিলেন, চিরকুটখানা পড়ে চশমা নামিয়ে আমার দিকে চাইলেন।

বললেন, 'হেডমাস্টার মশাই তোমাকে ডাকছেন। যাও।

চমকে উঠলুম। ক্লাস সুদ্ধ ছেলে আমার দিকে চোখ ফেরালে। সকলের মুখেই নির্বাক এক জিজ্ঞাসা, ব্যাপার কি? কি করেছিস?

কিন্তু কি যে আমি করেছি, ভেবে পেলুম না। বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে রজনীকে জিজ্ঞাসা করলুম। রজনী হেডমাস্টার

মশাই-এর খাস বেয়ারা। মেজাজ তাঁর চেয়েও চড়া। জবাব দিলে না।

কিছুদিন যাবৎ আমাদের ইস্কুলে গোলমাল চলছে। নতুন নিয়মে, ক্লাসে ক্লাসে লাইব্রেরী খোলা হলো। আমাদের ক্লাসে, ক্লাস এইট্-এ, ছেলে বেশী, দুটো সেক্শন। অথচ লাইব্রেরী হলো একটা। আর তা-ও থাকবে 'এ' সেক্শনে। 'বি' সেক্শনের ছেলেরা বেঁকে বসলে। 'এ' যে 'বি'-এর উপর এই সুযোগে ডাঁট নেবে, তা সহ্য করা যায় কিভাবে? 'বি'-এর ছেলেরা বললে, আমাদের জন্যে আলাদা লাইব্রেরী চাই। কর্তৃপক্ষ বললেন, তা কি করে হয়, প্রতি ক্লাসে একটি করে লাইব্রেরী, এই আমাদের 'গ্রান্ট্'। আর লাইব্রেরী হবে না। তবে তোমাদের ক্লাস বড়, বেশী বই দিচ্ছি। প্রস্তাবটা সেক্শন 'বি'-এর মনঃপূত হলো না। বললে, লাইব্রেরীটা আমাদের ঘরে থাকুক। কারণ এই সেক্শনেই ছেলে বেশী। তাদের সে দাবীও টিকল না। কর্তৃপক্ষ বললেন, বেশ, ছ'মাস করে থাকবে এক এক ঘরে। এবার 'বি'-এর ছেলেরা রাজী হলো। কিন্তু আরেকটা পাল্টা প্রস্তাব দিলে, প্রথম ছ'মাস আমাদের ঘরে থাকবে।

এইবার কর্তৃপক্ষ গেলেন চটে। বার বার 'বি'-এর ছেলেদের বেয়াদবি বরদাস্ত করা যায় না। বললেন, লাইব্রেরী 'এ' সেক্শনেই থাকবে। তাই থাকল। ফলস্বরূপ 'বি' একজোট হয়ে লাইব্রেরী বয়কট করলে। শাস্তিস্বরূপ 'বি' সেক্শনের সমস্ত ছেলের আট আনা করে জরিমানা হয়ে গেল। ছেলেরা একজোট হয়ে জরিমানা দিতে অস্বীকার করলে।

আমি হাফ্-ফ্রিতে পড়তুম। যথাসাধ্য গোলমাল থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করছিলুম। কিন্তু জরিমানাটা আমার ঘাড়েও এসে চাপল। কোথা থেকে জরিমানা দেব? বাবাকে বললে কোনো কাজ হবে না। ছেলেদের হঠকারিতায় যদি তাদের উপর ইস্কুল থেকে জরিমানা করা হয়ে থাকে তো তা শোধ করবার দায়িত্ব গার্জেয়ানের

নয়, ছেলেদের। আমার বাবা, এসব দিক থেকে বরাবর ছেলেদের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। ফাইনের কথা বলতেই বললেন, রোজগার কর! করে, ফাইন শোধ দাও।

হেডমাস্টার মশাই-এর কাছে দরবার করলুম। ফল হলো না। তাঁর এক কথা: নাই পেয়ে পেয়ে সব মাথায় উঠেছ! ইস্কুলের ডিসিপ্লিন ভাঙছ তোমরা। এবার শায়েস্তা না করে ছাড়ছিনে! এ ফাইন সব্বাইকে দিতে হবে। আইন সকলের জন্যই।

হেডমাস্টার মশাই কড়া লোক। সে আমলের রায় সাহেব। অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। সরকারী মহলে খুব দহরম মহরম। তাঁর আকাঙ্ক্ষা, মহামান্য সম্রাটের কোনো জন্ম-দিবসের খেতাব বিতরণ তালিকায় 'নাইটে'র ঘরে তাঁর নামটি দেখবেন। সামনের বছর সম্রাটের রজত-জয়ন্তী। এমনভাবে পালন করবেন, যা কি না জেলা শহর ছাড়িয়ে কলকাতায় গিয়ে ঢেউ তুলবে। ক্ষমতা থাকলে দিল্লীর দরবার অব্দি তা পৌঁছে দিতেন।

তাঁর ভয় ছিল স্বদেশীওয়ালাদের জন্যে। তাঁদের তিনি দু'চোখে দেখতে পারতেন না। ছোঁয়াচে ব্যাধির মতো দূরে রাখতে চাইতেন। তাঁর ইস্কুলের ত্রিসীমানার মধ্যে স্বদেশীওয়ালাদের প্রবেশাধিকার ছিল না। সেটা তো 'গভর্ণমেণ্ট এইডেড্ হাইস্কুল' নয়, যেন খোদ সরকারী দফতরখানা। যতবার বিদেশী ম্যাজিস্ট্রেট এসে আমাদের ইস্কুল পরিদর্শন করে গেছে, ততবার আমাদের 'এইড্' বেড়েছে। এহেন ইস্কুলের ছাত্রেরা কিনা কর্তৃপক্ষের অবাধ্য হচ্ছে! ডিসিপ্লিন ভাঙছে! আর তা-ও কখন? যখন কি না সামনে জুবিলি। রায় সাহেবের ধারণা হলো, স্বদেশীওয়ালারাই এর পেছনে আছে। শুধু জরিমানা করলে হবে কি না সন্দেহ।

মাইনের তারিখে সবাই মাইনে জমা দিলে, কিন্তু জরিমানা দিলে না। জরিমানা না দেওয়ায় মাইনে নেওয়া হলো না। হৈ হৈ ব্যাপার। এমন ঘটনা ইস্কুলের ইতিহাসে প্রথম। রায় সাহেব

নিঃসন্দেহ হলেন, স্বদেশী ঢুকেছে তাঁর ইস্কুলে। প্রত্যেকটি ছেলেকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে জেরা করেছেন। জানতে চেয়েছেন, কে এই উস্কানি দিচ্ছে? ভাল কথায়, ধমক দিয়ে, প্রলোভন দেখিয়ে —হরেক রকমে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কে এই দুষ্কার্যের মূলাধার তা বের করতে পারেননি।

এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে চলেছি। এর আগে দু'দিন প্রবল জেরা আমার উপর দিয়ে গেছে। কিন্তু আমি কারোরই নাম বলতে পারিনি। জানিনে, বলব কোত্থেকে?

হেডমাস্টার মশাই-এর ঘরে ঢুকতে বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। আমার দিকে এক নজর দেখে নিয়ে তিনি গম্ভীরভাবে বললেন. 'আমি জানতে পেরেছি, কারা এই সব গোলযোগ বাধাচ্ছে। ভেবো না আমি অন্ধ। আমার সকল দিকে নজর আছে। আমি জানি, তুমিও তাদের চেনো। এখন তোমার মুখ থেকেই তাদের নামগুলো জানতে চাই। বলো।'

আমার প্রাণ ততক্ষণে উড়ে গেছে। আমি কি করে এদের নাম বলব? নিজেই জানিনে, কেউ সত্যিই আমাদের উস্কানি দিচ্ছে কি না?

বলতে গেলুম। ভাল করে আওয়াজ বের হলো না।

প্রাণপণ চেষ্টা করে বললুম, 'আমি কিছুই জানিনে স্যর।'

রায় সাহেব ধমক দিলেন, 'মিথ্যে বলো না। তোমার চেহারা বলছে, তুমি জানো।'

বললুম, 'সত্যি বলছি স্যর, আমি কিচ্ছু জানিনে।'

রায় সাহেব আমার দিকে ঠাণ্ডা চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর ডাক দিলেন, 'কেরাণীবাবু!'

কেরাণীবাবু, ভাব দেখে মনে হলো, প্রস্তুত হয়েই ছিলেন, টপ করে বেরিয়ে এলেন। এই লোকটার কেন যে আমি বিষ নজরে পড়েছি, জানিনে। কিন্তু সর্বদা আমার পিছনে লেগে আছে। এমন

কি কাল সন্ধ্যেবেলা, খেলা দেখে ফিরবার পথে, রাজারঘাটের চাতালটায় বসে যখন দিন্দার সঙ্গে কথা বলছিলুম, তখন দেখি সেখানেও কেরাণীবাবু একবার উঁকি মেরে গেলেন।

রায় সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেরাণীবাবু বলুন তো, কি দেখেছেন ?'

কেরাণীবাবু গড়গড় করে যা বলে গেলেন, তার সার কথা হচ্ছে, স্বদেশীওয়ালারা জয়ন্তী উৎসব পণ্ড করবার ষড়যন্ত্র করেছে। দিন্দা তার পাণ্ডা। আমি হচ্ছি দিন্দার এজেণ্ট। গতকাল সন্ধ্যায় দিন্দা নাকি আমাকে নির্দেশ দিয়েছে, ছেলেরা যাতে কিছুতেই মাইনে না দেয়, তার ব্যবস্থা করতে।

আমি তো আকাশ থেকে পড়লুম। ভয়ও হলো। তার থেকেও বেশী হলো ঘৃণা। কেরাণীবাবুর মুখখানা কেমন যেন বিষাক্ত ঠেকল আমার চোখে।

রায় সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'এর পর তোমার কি বলবার আছে !'

রায় সাহেবের গলার স্বরে কি যেন ছিল, যেন মনে হলো একটা শীতল কথার স্রোত, আমাকে এক সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলুম। থরথর কাঁপতে লাগলুম। ঘামতে লাগলুম। আমি কিছু জানিনে স্যর। সত্যি কিছু জানিনে। মনে মনে অজস্রবার বললুম। কিন্তু মুখ দিয়ে একটি কথাও বের হলো না।

রায় সাহেব বললেন, 'বেইমানের জাত। তোর বাবা হাতে-পায়ে ধরে হাফ-ফ্রি করিয়ে নিয়েছে তোকে। নইলে নাকি তোর পড়া হবে না। তা এই কি তার প্রতিদান ? আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত। সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। হাতে হাতকড়া পড়বে। গলায় পড়বে ফাঁসির দড়ি। তা জানিস। বল, কি জানিস তুই ষড়যন্ত্রের।'

এমন অপমান, এত লাঞ্ছনা এর আগে আর পাইনি। কোথায়

ভয়-ডর ভেসে গেল। সমস্ত শরীরে তখন অপমানের জ্বালা। হেড-মাস্টার মশাই-এর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে চোখ তুলে কথা কখনো বলিনি। আজ সোজা তাঁর মুখের দিকে চাইলুম। চোখের দৃষ্টি হেডমাস্টার মশাইকে টপকে তাঁর পিছনে গিয়ে ঠেকল। মহামান্য সম্রাট পঞ্চম জর্জের এক বিরাট রঙ্গীন আবক্ষ ছবি সেখানে টাঙানো। তাঁর ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ির সঙ্গে রায় সাহেবের দাড়ির ছাঁটের অবিকল মিলটি সেই আশঙ্কাজনক মুহূর্তেও আমার নজর এড়ালো না।

আমরা স্বাধীন কি পরাধীন সে কথা এর আগে কখনো আমার মনে হয়নি। স্বদেশীওয়ালাদের কথা কানেই শুনেছি। তাঁদেরকে কখনো দেখিনি। আমার ধারণা ছিল তাঁদের দেখা যায় না। তাঁরা জেলখানা বলে ভয়ঙ্কর এক জায়গায় থাকেন। সরকার বাহাদুরের তাঁরা দুষমন নম্বর ওয়ান। সাহেব দেখলে বোমা ছোঁড়েন, আর গান করতে করতে ফাঁসি যান। আমি সেই স্বদেশীওয়ালা হব কি করে? আমি তো জেলে থাকিনে, বাড়ীতে থাকি। ইস্কুলে পড়ি। স্বদেশীওয়ালারা কি ইস্কুলে পড়ে? আমার এক মামা ছিল, নিতাই মামা, তাঁকে কখনো চোখে দেখিনি, শুনতুম, তাঁকে নাকি দুপুর বেলা পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ ধরল বলেই নাকি পারলে। নইলে নিতাই মামাকে ধরা পুলিশের সাধ্য ছিল না। তেল মেখে দুপুর বেলা আমগাছে উঠেছিলেন, আর খবর পেয়ে পুলিশ এসে হাজির। ধরে ফেললে নিতাই মামাকে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সঙ্গে তিনি নাকি জড়িত ছিলেন। আমরা জানতুম ওরাই স্বদেশীদলের। ওরা সব পারে।

আমি কী পারি যে স্বদেশী হব? গুলি ছোঁড়া দূরে থাক, বৃটিশ সরকারের সাম্রাজ্য টলানো দূরে থাক, ওই ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি যাঁর, সেই মহামান্য সম্রাটের ছবিটা একটু নড়াবার ক্ষমতা কি আমার আছে? এই ইস্কুলের কারোর আছে?

রায় সাহেবের গালাগালিগুলো তখনো আমার কানে বাজছে

···বেইমান···কথাটার মধ্যে এমন কি তীক্ষ্ণতা আছে, যা ভীরুর রক্তেও উষ্ণতা জাগায়? ঢেউ তোলে? আমার বুকেও তুলল। তুলল বলেই মনে হলো, এই প্রথমবার মনে হলো, আমি পরাধীন। এক গোলাম।

রায় সাহেব গর্জে উঠলেন, 'কি জানিস বল।'

আশ্চর্য, সেদিনের ঘটনাটা মনে পড়লে আজও আশ্চর্য লাগে, কি করে সেদিন আমার অত সাহস হয়েছিল। কি করে, একটা টুঁ শব্দ না করেও, অত আঘাত সহ্য করে গিয়েছিলুম।

রায় সাহেবের কথার একটা জবাবও সেদিন দিইনি। বেতের পর বেত খেয়েও চুপ করে ছিলুম। টুঁ শব্দ করিনি। শুধু অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম।

শেষ পর্যন্ত আমাকে উপলক্ষ করেই শহরময় আলোড়নের সৃষ্টি হলো। স্কুল থেকে আমার নাম কেটে দেওয়া হলো। ইস্কুলে স্ট্রাইক হলো। যে স্বদেশীওয়ালাদের রায় সাহেব এড়িয়ে চলতে চাইতেন, তাঁদের হাতেই ঘটনার নেতৃত্ব চলে গেল। তাঁরাই এসে ছেলেদের পরিচালনা করলেন। দিন্দা সত্যিই পাণ্ডা বনে গেলেন।

একমাস হৈ চৈ গোলমালের পর, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যস্থতায় আবার সব মিটমাট হয়ে গেল। আমাকে ফের ইস্কুলে ভর্তি করা হলো। হাফ-ফ্রি-শিপও বহাল রইল। সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট নিজের টাকায় আমাদের সেক্শনে লাইব্রেরী করে দিলেন।

সব মিটে গেল। শুধু রইল পিঠের দাগ, মনে জ্বালা, কেরাণী-বাবুর প্রতি ঘৃণা, আর স্বদেশীওয়ালাদের প্রতি শ্রদ্ধা। দিন্দার আমি প্রিয়পাত্র হয়ে গেলুম।

বুঝতে পারতুম দিন্দার মনে এক প্রচণ্ড জ্বালা আছে। তারই দাহ দিন্দাকে অস্থির করে তুলেছে। আমার থেকে বয়সে দিন্দা খুব বেশী বড় ছিলেন না—বড় জোর বছর চারেক। কিন্তু মনের বয়সে

আমাকে তিনি অনেক পিছনে ফেলে গিয়েছিলেন।

আমরা প্রকাশ্যে বড় একটা দেখাসাক্ষাৎ করতুম না। দিন্দা তা চাইতেন না। গঙ্গার ধার ধরে বেড়াতে বেড়াতে চলে যেতুম শ্মশান ছাড়িয়ে। বর্ষার পরে পলিপড়া চড়ায় নব-উদ্গত অজস্র ঝাঁউচারা সেদিকটায় অরণ্য সৃষ্টি করে রেখেছিল। তারই আড়ালে কোনো এক জায়গায় দু'জনে দেখা করতুম। সে কেমন ছায়াঘেরা জায়গা। সে কেমন রহস্যঘেরা জায়গা।

দিন্দা বলতেন, 'সাবধানে আসিস। আমার উপর সরকারী গোয়েন্দার নজর আছে।'

সেসব শুনে ভয় পেতুম। দিন্দার সঙ্গে যতক্ষণ থাকতুম, ততক্ষণ স্বস্তি থাকত না মনে। কেবল মনে হতো, এই বুঝি কেউ এল, কেউ আমাদের দেখে ফেললে। এই রকম অস্থিরতা অনেক দিন ভোগ করেছি।

দিন্দা গল্প বলতেন, ক্ষুদিরাম, কানাইলালের, যাঁরা সাহেব মেরে ফাঁসিতে ঝুলেছিলেন। গল্প বলতেন, চট্টগ্রামের বীর যোদ্ধাদের, যাঁরা চট্টগ্রামকে কয়েকটি দিন বৃটিশ শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন, জালালাবাদ পাহাড়ে যাঁরা লড়াই করেছিলেন বৃটিশ ফৌজের সঙ্গে। আমার মনে পড়ত নিতাই মামার কথা। গর্বে বুক ফুলে উঠত। রক্তে উন্মাদনা জাগত।

ঝাউ গাছের রহস্যময় সরসরানির সঙ্গে দিন্দার চাপা স্বরের ফিসফিসানি মিশে মিশে যে এক অপূর্ব ছায়া ছায়া রহস্যলোক গড়ে উঠত, তারই মধ্যে বসে বসে শুনতুম এক বিপ্লবী নরেন ভট্টাচার্যের আশ্চর্য কীর্তিকথা। কোথাও মিঃ মার্টিন, কোথাও এম এন রায়— হরেক নাম, হরেক বেশ ধরে আমেরিকা মেক্সিকো বার্লিন মস্কো চীনে বিপ্লবের বারতা বহন করে নিয়ে চলেছে এক বাঙ্গালী যুবক। দিন্দার বলাটা এত সুন্দর হতো যে, চোখের উপর তা যেন ছবি হয়ে ভাসত।

দিন্দা সেদিন তখনো আসেননি। সেই নিবিড় ঝাউবনের মধ্যে একা বসে আছি। হঠাৎ দূর থেকে পাতা সরানোর আওয়াজ। প্রথমে ভাবলুম, দিন্দাই বুঝি। কিন্তু এ তো দিন্দার পায়ের আওয়াজ নয়। তবে? হঠাৎ বুক ধুকপুক করে উঠল। তবে কি গোয়েন্দা? মুহূর্তে ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলুম। পর মুহূর্তেই সামলে নিলুম। পকেটের মধ্যে একটা বড় পেন্সিলকাটা ছুরি থাকত, সেইটে খুলে হাতে নিয়ে বসলুম। আমার মনে হলো, এ কেরাণীবাবু ছাড়া আর কেউ নয়। তা যদি হয়— সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে প্রতিহিংসাবৃত্তি জাগ্রত হয়ে উঠল। দেখলুম, দিন্দার সাহচর্যে কম লাভ হয়নি। আমার মধ্যে এরই ভেতর বিপ্লবীর অঙ্কুর দেখা দিয়েছে। আমি সাহসী হয়ে উঠেছি। সন্তর্পণে কে যেন এগিয়ে আসছে। একটা ঘন ঝোপের আড়ালে সরে গেলুম। পদশব্দ আরো কাছে এল। না, কেরাণীবাবু নয়, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম, একটা শ্মশান-কুকুর।

দিন্দা এলেন!

বললেন, 'ছাখ কি এনেছি। খবরদার, কারো কাছে বলিসনি।'

দিন্দা কাপড়ের তল থেকে একটা পুঁথি বার করলেন। হাতে লেখা পথের দাবী। শরৎবাবুর এই বইখানার কথা কিছুদিন যাবৎ দিন্দার মুখে শুনেছিলুম। সরকার পথের দাবী বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। যেই সে নিষিদ্ধ বই দিন্দার কাছে দেখলুম সেই মুহূর্তে আমার চোখে দিন্দা আর ক্ষুদিরাম এক হয়ে গেলেন।

পাঁচ-ছয় দিন ধরে আমরা বইখানা পড়লুম। দিন্দা পড়লেন আমি শুনলুম। দিন্দার সে তো পড়া নয়, মন্ত্রোচ্চারণ। দিন্দাকে ক্ষুদিরাম বলে মনে হয়েছিল, এর পর ধারণা বদলাল, তিনি হলেন সব্যসাচী। আর নিজেকে অপূর্ব নয়, মনে করলুম তলোয়ারকর। ইংরাজ সরকারের ধ্বংস-কামনায় দু'জনে মিলে

প্রতিজ্ঞা নিলুম। পথের দাবী ছুঁয়ে বিপ্লব করার শপথ নিলুম।

দিন্দার বাড়ী এই শহরে নয়, মাইল পাঁচ-ছয় দূরের এক গ্রামে। দিন্দা এখানে যার বাড়ীতে থাকতেন, তিনি মস্ত বড় গোঁসাই, জমিদার, তার উপরে ছিলেন সরকারী উকীল। দিন্দার দূর সম্পর্কের কি রকম যেন আত্মীয় হন।

দিন্দাকে ওরা আশ্রয় দিয়েছিলেন লেখাপড়া করবার জন্য। কিন্তু দিন্দা তার চেয়েও বড় কাজে হাত দিয়েছেন।

নিজেই বলতেন, 'পড়াশুনা করলে পাশ করব, চাকরি করব। তারপর? বিয়ে থা করে সংসারে মন দেব। এই তো সোজা রাস্তা। কিন্তু এই কী জীবনের সব? এই কি আমার জীবনের সব?'

বলতে বলতে দিন্দার মুখের রং বদলে যেত, ভাব পালটে যেত। সাধারণভাবে দেখতে গেলে দিন্দা সুপুরুষ। বয়সের তুলনায় বেশী সাবালক। লম্বা চওড়া দেহ। দীর্ঘ নাক, টানা চোখ, ফরসা রং। তবে মুখখানা কোমল। কিন্তু সেই কোমল মুখখানা কখনো কখনো, বিশেষ করে এই সমস্ত বিষয় আলোচনার সময়ে, কেমন যেন ক্রূর হয়ে উঠত, কঠিন হয়ে উঠত। সে মুখের দিকে চাইতে আমার ভয় ভয় করত। সেই মুহূর্তগুলোতে মনে হতো দিন্দার সঙ্গে একা একা যেন দেখা না করাই ভাল।

কিন্তু এসব তো কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। দিন্দার চোখে যেমন আগুন জ্বলত, তেমনি বইত করুণার ধারা।

দিন্দার সে মূর্তিও ভুলবার নয়, কখনো ভুলতে পারব না। তখন আমাদের মোটামুটি একটা দল গড়ে উঠেছে। দিন্দাই নেতা। আর আমরা তাঁকে অনুসরণ, না অনুসরণ বলব না, অনুকরণ করছি মাত্র গুটি কয়েক ছেলে।

মনোহর বলে একটা ছেলে আমাদের দলে জুটেছিল। দল বলতে সেটা এমন মারাত্মক কিছু নয়। আমরা সকলে একটা পাঠচক্র খুলেছিলুম। যত নিষিদ্ধ বই পড়তুম। আর আলাপ-

আলোচনা করতুম। মনোহরের ছিল তীক্ষ্ণ মেধা। সে বলত, শুধু আলাপ-আলোচনা আর পড়ায় সময় কাটালে কোনো লাভ হবে না। আমাদের মিশতে হবে লোকের সঙ্গে। তাদের দুঃখ, তাদের ব্যথা বুঝতে হবে। তাদের দুঃসময়ে সাহায্য করতে হবে।

কথাটা আমাদের মনে ধরল। আমরা সেবার কাজে লাগলুম। বে-ওয়ারিস মড়া পোড়াই। আর যাদের সেবা-শুশ্রূষার দরকার তারা খবর পাঠালে তাদের সেবা-শুশ্রূষা করে আসি।

কিন্তু বেশীদিন চলল না। মনোহরই ছিল এ বিষয়ে সব চাইতে উৎসাহী। 'তারই হঠাৎ একদিন বসন্ত হলো। আর সব থেকে খারাপ টাইপের। তাছাড়া ওরা ছিল গরীব। চিকিৎসা করবার পয়সা ছিল না। আমরা সাধ্যমতো চাঁদা তুলতে লাগলুম। কিন্তু তাতে আর ক'পয়সা ওঠে। রোগ বাঁকা পথ ধরল। বসন্তের গুটি উঠে আবার গায়ে বসে গেল। কি যন্ত্রণা! দিন্দা পাগলের মতো হয়ে উঠলেন। যে করেই হোক মৃত্যুর মুখ থেকে মনোহরকে বাঁচাতে হবে, এই যেন তাঁর প্রতিজ্ঞা। পাছে আমাদের দেহেও সংক্রমণ হয়, সেজন্য আমাদেরকে মনোহরের কাছে ঘেঁষতে দিতেন না। নিজেই সব করতেন। দিন্দার নিজের অবস্থাও ভাল না। তবু তাঁর যথাসর্বস্ব বিক্রী করলেন মনোহরের চিকিৎসার জন্য। কিন্তু মনোহর বাঁচল না। তেইশ দিন অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে, একদিন দুপুরে মারা গেল। দিন্দা মনোহরকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

দিন্দার সঙ্গে উত্তরকালে আমার মতভেদ হয়েছে। দিন্দা আমাকে তাঁর 'পয়লা নম্বরের শত্রু' আখ্যা দিয়েছেন। দু'জন দু'জনের কাছ থেকে সরে এসেছি বহু—বহু দূর। ইংরেজদের নাম মুখে আনতে দিন্দার মুখ ঘৃণায় যেমনভাবে বিকৃত হয়ে যেত, ধনিকশ্রেণী সম্পর্কে কোনো কিছু বলতে গেলে তাঁর চোখে জ্বলত যেমন প্রতিহিংসার আগুন, আজ আমাকে স্মরণ করতে গেলে তাঁর মনে সেইরকম ভাবই যে হয়, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তবু কেন

জানিনে, দিন্দার এই ছবিটাই—মৃত মনোহরের দেহটা দু'হাতে সাপটে ধরে দিন্দা ফুলে ফুলে কাঁদছেন—সব্বার আগে আমার চোখে ভেসে ওঠে। এখনকার এই কঠিন কঠোর ভাবলেশহীন মানুষটিকে দেখে সে দিন্দাকে আর চেনা যাবে না, সেটা বড় কথা নয়। সেই কোমল হৃদয়টা যে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, রাজনীতির কঠিন পেষণে তার যে বিনষ্টি ঘটেছে, সেটাই আফসোসের কথা। মানুষটা মরে সেই দেহে জন্ম নিয়েছে এক পলিটিসিয়ান, আফসোস শুধু তাই।

দিন্দার ছাত্রজীবন বেশীদিনের নয়। ফার্স্ট ক্লাসে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই তা শেষ হয়ে যায়। ওঁকে ইস্কুল থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। তখন আমরা আরো নিচু ক্লাসে পড়ি। দিন্দার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল গুরুতর! শরৎদাকে (আমাদের একজন টিচার) যখন ইস্কুলের মধ্যে থেকে পুলিশ রাজদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়, দিন্দা তার প্রতিবাদে ইস্কুল কম্পাউণ্ডের মধ্যেই 'বন্দেমাতরম্' বলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

তারপর থেকে দিন্দা আর গোলাম তৈরীর কারখানা (নামটা দিন্দার দেওয়া) মাড়াননি।

বলতেন, 'বড্ড অসোয়াস্তি লাগত। বুঝলি। ওই খাঁচাটার মধ্যে দু'দণ্ড বসতেও দম আটকে আসত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটানো তো দূরস্থান। আর কেন কাটাব? কেরাণী বনতে? ওই সাহেবগুলোর পা-চাটা কুকুর হতে?'

দিন্দার চোখে বিদ্যুৎ খেলে যেত। বহুদূরের কোথায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলতেন, 'আজ নিজে বেরিয়ে এসেছি, কাল তোরা আসবি, একদিন সমস্ত ভারত বেরিয়ে আসবে। বিদেশী শোষকদের ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে সাগর পারে ফেরত পাঠাতে হবে। সেদিনকে এগিয়ে আনাই আমার কাজ। ইস্কুল ছাড়াটা আমার প্রথম বিদ্রোহ।'

হঠাৎ দিন্দা একদিন ডুব দিলেন। কোথায় গেলেন জানিনে। প্রায় দেড়মাস দিন্দার কোনো খোঁজ পেলাম না। যে বাসায় তিনি

থাকতেন, ইস্কুল ছাড়বার পর আর তাঁদের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না। দিন্দার কাছে সে কথা প্রায়ই শুনতুম। তাঁরা অকারণে দিন্দাকে খেতে-পরতে দিতে নারাজ ছিলেন। তাঁরা বড়লোক, ইচ্ছে করলে দিন্দার মতো একশোটা লোককে অনায়াসে খাওয়াতে পারেন, খাওয়াতেনও। তাঁদের অসম্মতি লোক খাওয়ানোয় নয়, দিন্দাকে খাওয়ানোয়। দিন্দার ধরন-ধারণ ওঁরা পছন্দ করতেন না। দিন্দাকে না দেখে, দিন কুড়ি পরে, একদিন ও বাড়ীতে তাঁর খোঁজ নিতে গিয়েছিলুম। কিন্তু তাঁরাও কোনো খবর জানেন না বললেন।

পরীক্ষা এসে পড়ল। ইস্কুলের সঙ্গে একটা গোলমাল পাকিয়ে রেখেছি। হেডমাস্টার মশাই ফাঁক খুঁজছেন, তা তাঁর কাজকর্ম দেখলেই বেশ বোঝা যায়। কিছুদিন আগেই একটা সার্কুলার দিয়েছেন, যারা প্রত্যেক পেপারে শতকরা ষাট নম্বর রাখতে না পারবে তাদের ফ্রি-শিপ কাটা যাবে। বুঝতে পেরেছিলুম, আমিই উপলক্ষ। আমার ভয় ছিল অঙ্কে আর সংস্কৃতে। কাজেই বিপ্লব চিন্তা ছেড়ে দুর্বল বিষয় দুটোতে কষে মন দিলুম। দিন্দার কথাও চাপা পড়ে গেল।

পরীক্ষা শেষ হতে আর দিন দুই বাকী, দিন্দার এক পোস্ট কার্ড পেলাম। বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে দুটি কি তিনটি ছত্র লেখা—

টাইফয়েডে মরণাপন্ন হয়েছিলাম। দিন পনেরো পথ্যি করেছি। বড্ড একা। একবার আয় না!

ইচ্ছে হলো তক্ষুনি চলে যাই। পরীক্ষা-টরীক্ষা আর কি হবে দিয়ে। ইংরেজদের একটা গোলাম বাড়বে বৈ তো নয়। কিন্তু দিন্দার কাছে যা অনায়াসসাধ্য আমার কাছে তা অসম্ভব। পরীক্ষাটা তাই দিলাম, যথাসম্ভব ভালভাবেই দিলাম।

পরদিন সকালেই দিন্দার গ্রামে গিয়ে হাজির হলাম।

পথ চিনতুম না, রেল লাইন ধরে গিয়েছি, তাই মাইল খানেক বেশী ঘুরেছি। কিন্তু সে কথা মনেই পড়ল না। দিন্দার সঙ্গে

কতদিন পরে আবার দেখা হবে, সেই উত্তেজনায় পথের কষ্ট ভুলে গিয়েছিলুম।

খুঁজে খুঁজে দিন্দার বাড়ী বের করলুম। দিন্দা তখন চৌকীর উপর উঠে বসে বাটিতে করে দুধ না কি খাচ্ছিলেন। পাশে এক মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন। দিন্দার মতোই দেখতে, তবে একটু রোগা। শুনেছিলুম, দিন্দার এক বালবিধবা দিদি আছেন। বুঝলুম, ইনিই।

দিন্দার এ কি চেহারা হয়েছে!

আমাকে দেখে বাটি থেকে মুখ তুলে হাসলেন। কিন্তু সে হাসি এত ম্লান যে তাকে মুখ ভ্যাংচানি বলে মনে হয়। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, চওড়া হাড়ের উপর শুধুই চামড়ার ছাউনী, মাংস সব যেন ঝরে গেছে। গলাটা সরু হয়ে পড়েছে বলে মাথাটা অস্বাভাবিক রকম বড় দেখাচ্ছে।

আমার হাতে রুমালে বাঁধা কয়েকটা কমলালেবু ছিল।

দিন্দা সেটা দেখিয়ে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওটা কি?'

খুলে দেখে তো দিন্দার চোখ দিয়ে জল বেরোয় আর কি?

ছলছল চোখে দিদিকে বললেন, 'দিদি, ওর কাণ্ড দেখলি?'

আর আমাকে একটা ফাঁপা ধমক দিলেন, 'এ পাকামি করতে তোকে কে বললে।'

কিছু জবাব দিলাম না। দিদিকে প্রণাম করলুম।

দিদি সস্নেহে বললেন, 'থাক ভাই।'

দিন্দার পাশে গিয়ে বসলুম। দিন্দা আবেগভরে আমার হাতে চাপ দিলেন।

বললেন, 'এতদিন দিদি আর ডাক্তার ছাড়া আর কারও মুখ দেখিনি। তোকে দেখে বাঁচলুম। হ্যাঁ রে, পাঠচক্রটা উঠে গেছে না আছে?'

লজ্জা পেলাম। দিন্দা আসবার সঙ্গে সঙ্গে তা উঠে গিয়েছিল। ঘাড় নেড়ে জানালুম, নেই, উঠে গেছে।

দিন্দা ম্লান কণ্ঠে বললেন, 'জানতুম।'

এটা তিরস্কার না হতাশা, ঠিক বুঝলুম না। নিজেকে খুব অপরাধী মনে হলো। সত্যি ওটা চালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। মুখ নিচু করে নখ খুঁটতে লাগলুম।

দিন্দা বললেন, 'তোরা ছেলেমানুষ, তোরা কি ও সব পারিস? আবার ওটাকে গড়ে তুলতে হবে। ভাবিসনে তুই, আমাকে একবার উঠতে দে, সব আবার গড়ে তুলব। তুই ভেবেছিস, অসুখ হয়েছে বলে চুপচাপ আমি? মোটেই নয়। কত প্ল্যান্ করেছি, সব এক এক করে কাজে লাগাতে হবে। ভারতের মাটিতে যতক্ষণ একটিও ইংরেজ থাকবে, ততক্ষণ স্বস্তি নেই, বিপ্লব চাই।'

দিন্দার চোখে আগুন জ্বলে উঠল। মুখের ভাব কঠিন হয়ে এল। দৃষ্টি ভেসে গেল কোন সুদূরে। আমার হাত দুটো সজোরে দু'হাতে চেপে দিন্দা চাপা অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন, 'সশস্ত্র বিপ্লব চাই, আর্মড্ রিভলিউশন।'

তারপরই মুখ গুঁজে পড়ে গেলেন। ভয় পেয়ে দিদিকে ডাকলুম। দিদি আর আমি দিন্দাকে ধরাধরি করে শুইয়ে দিলাম। দিদি দিন্দার চোখে জলের ঝাপ্টা মারলেন, আমি মাথায় বাতাস করলুম। দিন্দা একটু পরে সুস্থ হয়ে চোখ মেললেন।

ম্লান হেসে বললেন, 'গায়ে আর একদম জোর নেই। মরতে মরতে বেঁচে উঠেছি কি না। একচল্লিশ দিন পরে ভাত খেয়েছি।'

বললুম, 'চুপ করুন।'

দিন্দা হাসলেন।

বললেন, 'যারা আমার বাবাকে মেরেছে, আমার মাকে মেরেছে, আমার দেশকে পদানত করেছে, তাদেরকে যেদিন দেশছাড়া করবো, চুপ সেই দিন করবো।'

শেষে দিদি ধমক লাগালেন। আমি চলে আসবার ভয় দেখালুম। তখন ঘন্টাখানেকের মতো দিন্দা চুপ করলেন।

কিন্তু সারাদিন ধরে একটু একটু করে ওঁদের পারিবারিক ইতিহাস যা শোনালেন, সবটুকু জোড়া দিলে তা এক মহাভারত হয়। বুঝলাম, দিন্দার মনে যে জ্বালা অহরহ রয়েছে তার উৎস কোথায়।

দিন্দার যখন বার বছর বয়েস, আর দিদির বয়েস চৌদ্দ, তখন দিন্দার বাবা এক অ্যাক্সিডেণ্টে মারা যান। তিনি ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। সাহেবদের এক মিলে কাজ করতেন। প্রায় ছ-সাত শ' টাকা মাইনে পেতেন। একদিন কাজের সময় দৈবাৎ মেসিনের মধ্যে ডান হাতখানা ঢুকে যায়। ফলে বাহুমূল থেকে সেটা কেটে বাদ দিতে হয়। দিন্দার বাবা বছরখানেক ভুগে মারা যান। ক্ষতিপূরণের কথা তুললে কোম্পানী আজ-কাল করে ঝুলিয়ে রাখে। বাবা ছিলেন খুব সাহেবভক্ত। ওদের সততায় বিশ্বাস করে মামলা করেননি। বাবা মারা যেতেই কোম্পানী ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করে।

দিন্দার মা ছিলেন খুবই তেজস্বিনী। তিনি কোম্পানীর নামে মামলা রুজু করলেন। ছু'বছর মামলা চলল। জমানো পুঁজি নিঃশেষ হলো, জমি-জমা বিক্রী হয়ে গেল। দিন্দার মা একটার পর একটা মামলায় হেরে গেলেন। দিন্দার বাবার হাত মেসিনে কাটা পড়েছিল, কোম্পানী সেটা অস্বীকার করলে। কোর্টেও তা প্রমাণ করলে।

মামলায় হেরে হেরে দিন্দার মা হার্টের অসুখে পড়লেন। দিদির বিয়েটা কোনোমতে এর মধ্যেই দিন্দার মা দিয়েছিলেন। বছর না ঘুরতেই সে বিধবা হয়ে এল। মা আর এ শোক সামলাতে পারলেন না। মারা গেলেন।

দিন্দা বললেন, 'মা'র শেষ কথা ক'টা এখনো কানে বাজে ভাই। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আমার ছুটো হাত ধরে মা বলেছিলেন, দিমু, তোকে রেখে যাচ্ছি আর তোর শত্রুকে রেখে যাচ্ছি। হয় তুই, নয় ইংরেজ, এদেশে ছুইজন যেন থাকিসনে বাবা।'

দিন্দা বললেন, 'ছ' বছর হয়ে গেল। কিন্তু যেন মনে হয়, মা

কাল মরল, কথাগুলো এমন তাজা, রাত-দিন কানে বাজে। কি করব ভাই, প্রতিহিংসায় অস্থির করে মারে। এই এক চিন্তা ছাড়া, আর কোনো কাজে মন দিতে পারিনে।'

দিন্দা সেরে উঠলেন। আর ওঁর বাড়ী যেতে পারিনি। মাস ছয়েক পরে দিন্দা একদিন এসেছিলেন। সেইদিনই চলে গেলেন। শরীরটা মন্দ সারেনি। তবে কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়া ভাব দেখলুম ওঁর। হয়তো ক্লান্তির জন্যই। ঘণ্টাখানেক একসঙ্গে ছিলাম। কিন্তু এবারে আর কথাবার্তা বিশেষ জমল না।

দিন্দাকে দেখে যতটা খুশি হয়েছিলুম, ততটাই হতাশ হলাম।

তারপর আমাদের গরমের ছুটি পড়ল। বাড়ীসুদ্ধ সবাই মামাবাড়ী চলে গেলুম। মামাবাড়ী থেকে দিন্দাকে এক দীর্ঘ পত্র লিখেছিলুম। তার মধ্যে না ছিল এমন জিনিস নেই। মামাবাড়ীর বর্ণনা। এখানে নতুন যে ছেলেটির সঙ্গে মাত্র আলাপ হয়েছে তাকে কি করে আমাদের ভবিষ্যৎ বৈপ্লবিক দলে আনা যায় তার পরামর্শ। দিন্দার নির্দেশমতো চলবার প্রতিজ্ঞা করে শপথ নিয়েছি, সেটা অব্দি তাঁকে জানিয়েছিলুম।

চিঠি ডাকে দেবার পর থেকে সে কি উৎকণ্ঠা নিয়ে গ্রামের ডাকঘরে প্রতিদিন আমার হাঁটাহাঁটি। কিন্তু জবাব আর আসে না। কেন? কি হলো? ঠিকানা ঠিকমতো লিখেছি কি? কত রকম চিন্তা আসত মাথায় তার ঠিক নেই। হঠাৎ একদিন মনে হলো, চিঠিখানা পুলিশের হাতে পড়েনি তো? সর্বনাশ! চোখে অন্ধকার দেখলুম।

(যতদিন না পুলিশের লাঠি খেয়েছি, ততদিন পুলিশের ভয়টা আমাকে ছাড়েনি। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছিল।)

পুলিশের ভয় ঢুকতেই আমার ঘুম মাথায় উঠল। ভয়ে কাঁটা হয়ে রইলুম।

এমন সময় একদিন খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় অপ্রত্যাশিতভাবে

দিন্দার খবর পেলুম। ওঁদের গ্রামের এক ডাক্তারকে খুন করবার প্রচেষ্টার জন্য দিন্দার এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। দিন্দা খুন করতে গিয়েছেন? দিন্দা? প্রথমটায় আমি বিশ্বাস করিনি।

কিন্তু বাড়ীতে ফিরে জানলুম ঘটনাটা সত্যি। কারণটাও জানলুম।

দিন্দার অসুখের সময় ডাক্তারটা ঘন ঘন ওঁদের বাড়ীতে আসত। সেই সময় দিদির সঙ্গে ডাক্তারের একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ডাক্তার দিদিকে বিয়ে করবে বলে ফুসলিয়েছিল। তারপর দিদির বাচ্চা হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে ডাক্তার সরে পড়ে। দিন্দা অনেক চেষ্টা করেছিলেন। দিদি ডাক্তারের পায়ে ধরে পর্যন্ত অনুরোধ করেছিলেন ওকে বিয়ে করতে, অন্তত শুধু বিয়েটা করতে, ডাক্তারের ঘর করতেও চাননি। কিন্তু ডাক্তার সব কিছু অস্বীকার করে বসল। উপায়ান্তর না দেখে দিদি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। শোনা যায় সে বিষও নাকি ডাক্তারই দিয়েছিল।

দিদি মরবার দিন পাঁচেক পরই ডাক্তার বিয়ে করে বৌ নিয়ে এল। আর সেই দিনই নাকি দিন্দা ওকে খুন করতে যান। এক বাড়ী লোকের মধ্যে ডাক্তারের টুঁটি টিপে ধরেছিলেন।

উত্তরকালে দিন্দা সব চাইতে উগ্র বিপ্লবী হয়েছিলেন। তাঁর কৈশোরকালের সমস্ত রকম কোমলতা বিসর্জন দিয়েছিলেন। মানুষকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির ক্রীড়নক ছাড়া আর কিছু দেখতেন না। যে জন্যে আমার সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ দেখা দেয়। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। কিন্তু সমস্ত রকম বৈষম্য সত্ত্বেও, এমন কি দিন্দা আজ যদি রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পায়, কালই হয়তো আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে, এ ধ্রুব জেনেও, যখনি দিন্দার পিছনের ইতিহাসটা আমার মনে পড়ে তখনি দিন্দার প্রতি সমবেদনায় মন ভরে ওঠে। এ অবস্থায় আমি পড়লে কি করতাম, কে জানে? রাষ্ট্রশক্তি যাকে আশ্রয় দেয় না, সমাজ যার উপর অন্যায় করে, তার বিপ্লবী হওয়া ছাড়া আর কি গতি?

করবীদি

লখনউতে নেমে শুনলাম কলকাতার গাড়ী তখনো আসেনি। খবর নিয়ে জানলাম, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সেটা এসে পড়বে। বাংলার ডেলিগেটরা সব সেই গাড়ীতেই আসছে।

আমিনাবাদে ক্যাম্প, যেতে আসতে সময় যাবে, কাজেই আমি ঠিক করলাম, কলকাতার গাড়ী না আসা পর্যন্ত স্টেশনেই থাকব। আমি বিহারে থাকি, কাজেই বিহারের ডেলিগেট।

একজন কমরেডকে বললাম, 'কমরেড, আমার জিনিসপত্র তোমার জিম্মায় রাখলাম। তোমরা ক্যাম্পে যাও। বাংলার কমরেডরা এলে আমি তাদের সঙ্গে যাব।'

ফেব্রুয়ারী মাস। বেশ শীত। লখনউতে আমাদের পার্টির অল ইণ্ডিয়া কনফারেন্স। ডিসেম্বরে হবার কথা, পেছিয়ে গেল দু' মাস।

গাড়ী আসবার সময় যত এগিয়ে আসে, আমার উত্তেজনা তত বাড়ে।

দিন্দা আর করবীদি আমাকে দেখে নিশ্চয়ই অবাক হবেন। দিন্দার বিস্ময় বোঝা যাবে না, তাঁর মুখে কোনো ভাবাবেগের রেখাই বড় একটা ফুটতে চায় না। কিন্তু করবীদির? করবীদির কথা আলাদা। সমস্ত মুখে-চোখে তার খুশি উপছে পড়বে। এ আমি দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট।

গাড়ী এল। আরে বাবা! বাংলার ডেলিগেট এসেছেও প্রচুর। তিনটে কামরা বোঝাই। ফেস্টুনে, পতাকায় কামরাগুলো মুড়ে দিয়েছে। আর কি উৎসাহ তাঁদের! ঘন ঘন শ্লোগান দিয়ে স্টেশন কাঁপিয়ে ছাড়ছে।

কামরা খালি করে সব প্লাটফরমে নামল। জিনিসপত্র সামাল দিতে ব্যস্ত হলো। বুক ঢিপ ঢিপ উত্তেজনা নিয়ে এগিয়ে চললাম পরিচিতের ভিড় ঠেলে।

ঐ যে দিন্দা। হঠাৎ নজরে পড়ল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দিন্দার হাত ধরে ঝাঁকানি দিলাম।

'এই যে দিন্দা, আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করছি, করবীদি কই?'

আমাকে দেখে দিন্দা খুশি হয়েছিলেন। আমার কথা শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন।

জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে বললেন, 'আসেনি।'

করবীদি আসেনি? আমি অবাক হলাম। 'তবে কি করবীদি অসুস্থ?'

দিন্দা বললেন, 'না।'

করবীদি অসুস্থ নয়, অথচ কনফারেন্সে এল না, ব্যাপার কি?

মনে পড়ল সেদিনের কথা। দিন্দা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে কলকাতা থেকে যেদিন করবীদির সঙ্গে ফিরলেন। জয়নগরের কনফারেন্সে যে চোট দিন্দা খেয়েছিলেন, তখন তার ঘা শুকিয়েছে কেবল, কিন্তু দুর্বলতা যায়নি। ছবিটা এখনো ভাসছে আমার চোখে।

করবীদির উপর ভর দিয়ে দিন্দা নামলেন। আমি এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরলাম।

ঘোড়ার গাড়ী করে তিনজনে যখন ফিরছিলাম, তখন ফিসফিস করে করবীদিই খবরটা দিলে।

বলল, 'আমি দিন্দাকে বিয়ে করছি। লখনউতে অল ইণ্ডিয়া কনফারেন্স, দিন্দার ইচ্ছে বিয়েটা তখনই হয়।'

সেদিন খুবই চমক লেগেছিল। তবু জয়নগরের ঘটনার পর তা সম্ভব বলেই মেনে নিয়েছিলাম। খুশিও হয়েছিলাম।

তবে এবার দিন্দা আমাকে যে চমক দিলেন, তার আর তুলনা হয় না।

টাঙ্গা করে দু'জনে ডেলিগেট ক্যাম্পে রওনা দিলাম। যেতে যেতে দিন্দা বললেন, 'করবী পলিটিক্স ছেড়ে দিয়েছে।'

সে কি! চমকে উঠলাম, 'কেন?'

দিন্দা বললেন, 'বিয়ে করে ঘর-সংসার করছে।'

একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'ভুল বুঝেছিলাম করবীকে। কমরেড, ওকে চিনতে ভুল হয়েছিল আমার।'

খপ্ খপ্ টাঙ্গার ঘোড়া ছুটেছে। ঝাঁকুনি লাগছে দু'জনের।

এলোমেলো ভেসে ওঠা বহু ঘটনার সঙ্গে আমার আর একটি দিনের কথাও মনে পড়ল। দিন্দা সেদিন করবীদির কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন, বলেছিলেন—কমরেড, তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম।

এই তো সেদিনের কথা। স্পষ্ট চোখে ভাসছে দৃশ্যটা। আমি পার্টি অফিসে বসেছিলাম। দিন্দা, করবীদি, মলয় দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ স্কোয়াডের সঙ্গে ঘরে ঢুকল। সবাই অল্পবিস্তর উত্তেজিত। টাকা ভালই আদায় হয়েছে স্ট্রীট কর্ণার মিটিং-এ। মলয় তো গুনতেই বসে গেল।

এক টাকার নোট আটখানা, খুচরো সাঁয়ত্রিশ টাকা সাড়ে ছ' আনা আর একটা চুড়ি, ব্রোঞ্জের উপর সোনার পাত মোড়া চুড়ি।

'ক্ষয়ে গেছে বহু ব্যবহারে, বুঝলি', কমরেড মলয় সেন চুড়িটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। তারপর বলল, 'রিয়েল দাম হবে বড় জোর টাকা আষ্টেক। কিন্তু কমরেড, বাজারের দাম, পণ্যমূল্যই এ চুড়ির আসল দাম নয়। এর পিছনে যে ত্যাগ, সেইটেই হলো আসল আর তার দাম কে কষবে! কি বলো করবীদি?'

করবীদি সাফল্যের উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে। দুর্ভিক্ষ তহবিলে আজকের সংগ্রহ গত সব দিনের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। একদিনেই সংগ্রহ হয়েছে, চুড়ির বাজার মূল্যটা ধরেই, তিপ্পান্ন টাকা সাড়ে ছ'আনা। এ অনেক। আমাদের শহর থেকে যে এত টাকা তোলা যাবে, তা ধারণা ছিল না। আর এর সবটুকু কৃতিত্ব করবীদির, করবীদির একার।

করবীদি মলয়ের কথার জবাব দিল না।

বলল, 'কমরেড, এ তো সবে শুরু। এখনো অনেক পথ বাকী। মনে রেখ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ তহবিলে আমাদের যা দেয়, তার কাছে পৌঁছতেও আমরা পারিনি।'

'পারব কমরেড,' মলয় আবেগভরে বলে উঠল, 'এখন বিশ্বাস জন্মেছে, তোমাকে দেখে সাহস বেড়েছে, মনে হচ্ছে আমাদের কোটা আমরা ছাড়িয়েই যাব।'

মলয় আমাকে বললে, 'আজকের সভায় গেলিনে, বড্ড মিস করলি। করবীদির এ ধরনের বক্তৃতা আগে আর কখনো শুনিনি। করবীদি দুর্ভিক্ষপীড়িতদের যা একখানা বর্ণনা দিলে না, তা এত ভিভিড, বোধ করি ফটো তুলেও দেওয়া যেত না। সেখানে সেই সভায় এমন একজনও কেউ ছিল না, যার চোখে জল না এসেছে। তারপর যখন করবীদি বললে, এদের বাঁচাবার দায়িত্ব আপনাদেরই। আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন না লক্ষ লক্ষ শীর্ণ হাত আপনাদের দিকে প্রসারিত করে আপনাদের লক্ষ ভাই, লক্ষ বোন বলছে, ম্যঁায় ভুখা হু, ওগো আমাদের বাঁচাও, কি বলব ভাই, চোখের সামনে যেন

লক্ষ হতভাগ্যের সেই ক্ষুধাশীর্ণ অস্থিসার চেহারা ফুটে উঠল। তারপর করবীদির প্রাণঢালা আবেদন, আমার ভাণ্ডার আছে ভরে, আপনাদের সবার ঘরে ঘরে। দিন, যথাসাধ্য দিন এই তহবিলে। বৃষ্টির মতো পড়তে লাগল আনি, দুআনি, সিকি। করবীদি তাতেও ক্ষান্ত হলো না। এই, এই মাত্র, এই! বন্ধুগণ, এই কি আমাদের সব? সর্বস্ব?

'বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। করবীদির এই দৃপ্ত আহ্বানে এগিয়ে এল এক দরিদ্র মধ্যবিত্তের মেয়ে। ক্লাস নাইনের ছাত্রী। বললে— তবু তো আমরা একবেলা খাচ্ছি। কি হবে এই অলঙ্কারে। নিন, এটাও নিন। পরীক্ষার ফী দেব বলে রেখেছিলাম। কিন্তু আগে প্রাণ, পরীক্ষা পরে। বলেই মেয়েটি ছুঁড়ে ফেললে চুড়িগাছা। এই একটি মাত্র গহনা সেই মেয়েটির সম্বল। তারপর শুরু হলো আশ্চর্য কাণ্ড। যে বৃষ্টি বন্ধ হয়েছিল, দ্বিগুণ জোরে শুরু হলো তার বর্ষণ। আস্ত আস্ত টাকা, আধুলি। এই ছ্যাখ!' মলয় উল্টে-পাল্টে দেখালে টাকাগুলো।

দিন্দা আহ্লাদে ডগমগ হয়ে উঠলেন। করবীদির একখানা হাত ধরে আবেগভরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, 'সাবাস কমরেড, তুমিই আমাদের মধ্যে প্রথম স্ট্যাখানোভাইট্। তোমার মতোই হাজার হাজার স্ট্যাখানোভাইট্ আজ সোভিয়েটের ভিত গড়ে তুলছে। রাশিয়ায় হলে তুমি স্তালিন পুরস্কার পেতে।'

দিন্দার কথা শুনে আমরাও খুশিতে ফুলে উঠলাম। একে একে করবীদির হাত ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সাবাস দিলাম।

করবীদি তো গর্বে ফাট-ফাট। ওর মুখ-চোখ দিয়ে যেন দীপ্তি বের হতে লাগল।

আমার উপর ছিল পার্টি পত্রিকায় রিপোর্ট পাঠাবার ভার। করবীদিকে আমাদের প্রথম স্ট্যাখানোভাইট্ বলে চালিয়ে দিলাম। লিখলাম, করবীদির আহ্বানে স্কুলের দরিদ্র ছাত্রীও একমাত্র অলঙ্কার

খুলিয়া দিল। তার পরে এক কাহিনী জুড়ে দিলাম। একমাত্র চুড়ি নিয়ে সে বাজারে এসেছিল, বন্ধক দিয়ে পরীক্ষার ফি যোগাড় করতে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ তহবিলে সাহায্যের জন্য তাও দিয়ে দিল।

দিন্দা করবীদিকে বললেন, 'কমরেড, আমি ভুল স্বীকার করছি। তোমাকে আমি প্রকাশ্য রাজনীতিতে আসতে বাধা দিয়েছিলাম, সে ভুলের জন্য আমি লজ্জিত।'

করবীদি হাসল পরিতৃপ্তির হাসি।

বলল, 'তাতে কি, ভুল তো মানুষেরই হয়। ভুল স্বীকার করবার সৎসাহস থাকে শুধু মার্ক্সিস্টদের। দিন্দা, তুমি যে খাঁটি মার্ক্সিস্ট, তারই প্রমাণ দিলে। কিন্তু ভুল তো আমার কাছে করনি, করেছ শরৎদার কাছে, ভুলটা তার কাছেই স্বীকার কর না!'

দিন্দা বলল, 'শরৎদা, শরৎদা মার্ক্সিসিজমের কি বোঝেন! বড্ড ইওটোপিয়ান।'

করবীদির মুখটা ম্লান হয়ে গেল। বলল, 'শরৎদাকে তুমি বুঝতে পারনি দিন্দা।'

দিন্দার সঙ্গে টাঙায় যেতে যেতে সে সব কথা মনে পড়তে লাগল। মনে পড়ল, করবীদি যেদিন প্রথম পার্টি অফিসে এল, সেদিনের কথা। দিন্দা সেটা মোটেই পছন্দ করেননি সেদিন।

করবীদি যে আমাদের পার্টিতে বেশ কিছুদিন হলো যোগ দিয়েছে, তা আমরা জানতাম না। পরে শুনলুম করবীদি পার্টিতে এসেছে প্রায় বছর দুয়েক।

দিন্দা বললেন, 'করবীদিকে পার্টি অফিসে এনে ভাল করলেন না শরৎদা।'

দিন্দা বলেছিলেন দুটো কারণে তিনি করবীদির প্রকাশ্যে আসা পছন্দ করেননি। প্রথম, গোপনে রাখলেই করবীদিকে দিয়ে বেশী কাজ পাওয়া যেত। দিন্দার ইচ্ছে ছিল করবীদিকে দিয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করানো। পরিচয় ভাঁড়িয়ে বিভিন্ন পার্টির চাঁইদের সঙ্গে দহরম-

মহরম করে তাদের গুপ্ত খবরটি এনে দেওয়া—এই ধরনের কাজেই দিন্দা করবীদিকে লাগাতে চাইছিলেন। আরেকটা কারণও দিন্দা দেখিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমাদের শহরটা বড় গোঁড়া। ছেলেমেয়েদের প্রকাশ্যে মেলামেশা লোকে ভাল চোখে দেখবে না। এই নিয়ে পার্টির বদনাম রটবে। ক্ষতি হতে পারে তাতে।

শরৎদা শান্তভাবে সব যুক্তি খণ্ডন করেছিলেন।

বলেছিলেন, 'ছাখ দিনু, পলিটিক্সকে হাত নোংরা করবার অস্ত্র ভাবছ কেন? আমাদের যে জীবন আজ অসম্পূর্ন, অসামঞ্জস্যে ভরা, অসুন্দর, তাকে সম্পূর্ণ করতে হবে, তাতে সামঞ্জস্য আনতে হবে, সেই জীবনকে সুন্দর করে তুলতে হবে। তাই না আমরা পলিটিক্সে নেমেছি। সেই পলিটিক্স যদি নোংরা হাতে কর, তবে কি মহৎ উদ্দেশ্যে পৌঁছতে পারবে ভেবেছ? কখনই না। ময়লা জলে কাপড় ধুলে তা কি সাফ হয় কখনো? ষড়যন্ত্র, গুপ্তবৃত্তি—ওসব হচ্ছে সুড়ঙ্গ, ও পথে আলো নেই, অন্ধকার। আমাদের কাজ অন্ধকার সরানো, নিজেদেরকে অন্ধকারে জড়ানো নয়। প্রচুর আলো পড়বে তবেই না জীবন সজীব সতেজ হবে, আর তেজোদ্দীপ্ত জীবনই পারে সব রকম বাধাবন্ধ ভেঙে চুরমার করে ফেলতে। জীবনের লক্ষণই হচ্ছে পরিপূর্ণ হওয়া। স্বাধীনতা সেইজন্যই দরকার। করবী নিজে যদি স্বাধীনতার আস্বাদ না পায়, আলোর পিপাসা যদি ওর তীব্র না হয়, তবে ও অন্যের স্বাধীনতা আনবার সংগ্রামে সাহায্য করবে কি করে? ওকে গোপন রেখ না, অন্ধকারে রেখ না, ওকে আলোয় আন, প্রকাশ্য কর।'

শরৎদার প্রত্যেকটি কথা আমার মনে গাঁথা আছে। সেদিন ওঁর কথা শুনতে শুনতে দেখলাম, করবীদি কেমন আশ্চর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পরদিন খুব ভোরে করবীদি আমাদের বাসায় এসে হাজির। ঘুম ভাঙল আমার।

বলল, 'তুই আমার ভাই।'

হাসলাম। করবীদি আমার এক দিদির বন্ধু। একসঙ্গে পড়ত।

বললাম, 'হঠাৎ এই খবরটা দিতে এত ভোরে ছুটে এসেছ। এতদিন পার্টির সঙ্গে আছ, সে খবর তো একদিনও বলনি করবীদি।'

করবীদিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম। করবীদি যেন জ্বলছে। অত ভোরেই স্নান সেরে এসেছে। চুলের মৃদু গন্ধে আমার ঘরটা ভরে গেল। আর করবীদির উজ্জ্বল দীপ্তি আমার মনে যেন হাজার পাওয়ারের আলো ছড়িয়ে দিলে।

করবীদি বলল, এতদিন তো আর প্রকাশ্যে হাঁটবার অধিকার পাইনি।'

বলল, 'চল তো ভাই, একবার শরৎদাকে প্রণাম করে আসি। কাল রাতে ঘুমোতে পারিনি। তুই জানিসনে, কাল আমার কি পরিবর্তন ঘটে গেছে। এতদিন যেন আমি পাতালপুরীর বাসিন্দা ছিলাম। দু'বছর পার্টিতে যোগ দিয়েছি, তোরা কেউ জানিসনে। দিন্দা জানে। আর এই দুটি বছর ধরে অন্ধকার পথে হেঁটেছি। দিন্দা বলেছিল, সেইটেই প্রয়োজন, আমার কর্তব্য। বিপ্লবীর কাছে আত্ম বলে কিছু নেই। আত্মত্যাগই ধর্ম। এই দু'বছর ধরে দিন্দাকে শুধু খবরই জুগিয়ে এসেছি। কি ভয়ে, কি উত্তেজনায় যে সময়টা কেটেছে কি বলব। জানতাম না তো স্বাধীনতার অর্থ বুক ফুলিয়ে সোজা পথে চলা। শরৎদা আমার বন্দীদশা ঘোচালে। চল গুরুপ্রণাম করে আসি।'

মেয়েরা যতটা ভাবপ্রবণ হতে পারে করবীদিও তাই। ভাবের ফানুস একটি। তবু ভাল লাগল করবীদিকে। বোধ হয় অন্তরঙ্গ হতে এসেছে বলেই।

বললুম, 'বসো, এত তাড়াহুড়ো কেন? শরৎদা কিছু পালিয়ে যাচ্ছে না। এসেছ এই ভোরে, চা খাও।'

না না না। করবীদি অস্থির হয়ে উঠল। 'আগে, চল শরৎদার

কাছে যাই। এসে চা খাব।'

'কেন, গুরুপ্রণাম না করে বুঝি জল গ্রহণ করবে না। পুণ্যি হবে না ?'

করবীদি ঠাট্টাটা বুঝল। এক মুহূর্তে সব উৎসাহ নিবে গেল। গম্ভীর ভাবে আমার দিকে চাইল। আবার একটু খোঁচা দিলাম।

'গোঁসাই বংশের মেয়ে তুমি। তোমার রক্তকণিকায় গুরুবাদ মেশানো। আজ শরৎদার পাদোদক নিতে যাচ্ছ, পরে মার্কস্ নামের জপমালাও হয়তো নেবে একটা। খুব বিপ্লবী হয়েছ ! মার্কস্‌বাদী হওয়া—'

করবীদি হঠাৎ বলল, 'এসব কথা থাক। চল চা খাই।'

তারপরও করবীদি কিছুক্ষণ ছিল। গল্পটল্প করবার পর উঠে পড়ল।

বলল, 'তুই তবে থাক, আমি বাড়ী যাই।'

বললাম, 'সে কী, শরৎদার ওখানে যাবে না ?'

করবীদি হাসল। কিছু ব্যথা আর কিছু লজ্জা মেশা অপ্রস্তুত একটুকরো হাসি।

বলল, 'না, যাব না।'

বললাম, 'করবীদি, তুমি কি রাগ করলে ?'

করবীদি স্থির দৃষ্টিতে আমাকে চেয়ে দেখল। ম্লান মৃদু হাসল।

বলল, 'না, রাগ করিনি। তবে দুঃখ পেয়েছি তোর কথায়। কারও উপর শ্রদ্ধা থাকা কি মার্কস্‌বাদীর কাছে অপরাধ ?'

বললাম. 'বিপ্লবীর কাছে ওসব খেলো সেন্টিমেন্টের কোনো দাম নেই। ওসব হচ্ছে পাতি বুর্জোয়া ভাবালুতা।'

করবীদি বলল, 'কি জানি। আমার এই উৎসাহ, এ তো আমার জীবনেরই স্পন্দন। এটাকে তোর মনে হলো ভাবালুতা। তুই ঠাট্টা করলি। হয়তো শরৎদাও তোর মতো বিদ্রূপ করবে।'

করবীদি একটু থামল। কি যেন বলতে যাচ্ছিল। বলল না।

আমার দিকে চাইল। ম্লান হাসি আরেকবার ফুটে উঠল ওর মুখে।

বলল, 'চললাম তাহলে।'

দরজার পাশে আঁস্তাকুড়ে করবীদি কি যেন ছুঁড়ে ফেলে চলে গেল। দেখি এক ঠোঙ্গা ফুল। শিউলি।

মনে মনে হাসলাম। করবীদি, গোঁসাইবাড়ীর মেয়ে তুমি। গায়ে গুরুগিরির গন্ধ এখনো ভুরভুর করছে। ও গন্ধ খসাতে হবে।

সেদিনকার মিটিং-এর যে রিপোর্টটা পাঠিয়েছিলাম আমাদের পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্রে, পরের সপ্তাহের কাগজে দেখলাম তা খুব ফলাও করে ছাপা হয়েছে। টাকার অঙ্কটা দিন্দা একটু বেশী করে দিয়েছিলেন। আমাদের সেই মিটিং-এ প্রায় চুয়ান্ন টাকার মতো উঠেছিল, দিন্দা রিপোর্টে লিখলেন তিনশ'। বললেন, অন্যান্য ইউনিটের কমরেডরা এতে উৎসাহ পাবে কাজে। এমনি করেই শুরু হবে টাকা তোলার সোস্যালিস্ট কম্পিটিশন।

পত্রিকা অফিস থেকে চিঠিও এসেছিল, করবীদির একটা ভাল ফটো পাঠাতে। পরের সংখ্যায় যাতে ছাপানো যায়।

করবীদির বাসায় সেটা আনতে গেলাম। গিয়ে দেখি, তুমুল তর্ক বেধে গেছে দিন্দা আর শরৎদাতে। করবীদি লজ্জিতভাবে বসে আছে। মলয় নখ খুঁটছে বসে বসে।

শরৎদা বললেন, 'মিথ্যা মিথ্যাই।'

দিন্দা বললেন, 'মিথ্যে, কোনটা মিথ্যে ? সেদিন চুড়িটা পড়েছিল, তা কি মিথ্যে ? টাকা পয়সা যা সংগ্রহ হয়েছিল, সে সব কি মিথ্যে ?'

শরৎদা বললেন, 'কি মিথ্যে, কি সত্যি সব থেকে তুমিই তো ভাল জান দিনু। চুড়িটা সেদিন একটা মেয়ে খুলে দিয়েছিল, তা ঠিক। তবে ও চুড়ি সে দান করেনি। আবার তাকে ফেরত দেওয়া হয়েছে সেটা। তিনশ' টাকা তো সেদিন ওঠেনি।'

দিন্দা চুপ করে গেলেন।

তারপর একটুক্ষণ বাদেই বলে উঠলেন, 'কিন্তু, কোনো খারাপ

মতলবে তো তা করা হয়নি। সেদিন ঐ মেয়েটি চুড়িটা ওভাবে খুলে দিয়েছিল বলেই না অতগুলো টাকা উঠে এল। আমি তো এতে করবীর দোষ দেখিনে। বরং ও যে মেয়েটাকে তালিম দিয়ে ওভাবে কাজটা হাসিল করতে পেরেছে, তার জন্য ওকে আমি তারিফ দিই।'

শরৎদা চমকে উঠলেন, 'কি বললে, করবী এটা করিয়েছে!—করবী! তুমি।'

শরৎদা যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। অবাক হয়ে করবীদির মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলেন।

করবীদি লজ্জায় থতমত খেয়ে বলতে গেল, 'শরৎদা, কেন এটা করতে হয়েছে—'

শরৎদা বাধা দিলেন। 'থাক, এক মিথ্যে ঢাকতে আরও মিথ্যে শুনতে চাইনে। এ করে কার চোখে তোমরা ধুলো দিচ্ছ? এই তোমাদের রাজনীতির উপায়? ছিঃ।'

শরৎদা যেন করবীদিকে চাবুক মারলেন। করবীদি মুখ নিচু করে বসে থাকল। শরৎদা উঠে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ গুম মেরে থেকে করবীদি হঠাৎ খুব চটে উঠল।

বলল, 'অত পিওর থাকতে গেলে আর পলিটিক্স করা চলে না। রামকৃষ্ণ মিশনে ভর্তি হওয়াই ভাল।'

শরৎদা কেন জানিনে ঠিক সেই সময়েই ফিরে এলেন। ঘরে পা দিয়েই করবীদির মন্তব্য শুনলেন। একবার কি যেন বলতে গেলেন, কিন্তু না বলেই যেমন এসেছিলেন, তেমনই বেরিয়ে গেলেন। শরৎদা যে কথাটা শুনবেন, এটা করবীদি ধারণা করতে পারেনি। করবীদির মুখে আর কথা নেই। মুখখানা মুহূর্তে সাদা হয়ে গেল।

দিন্দা বললেন, 'ভাল ভাল কথা আমরাও জানি। ভাল কথা বললেই ভাল ফল পাওয়া যায় না। আলো চাই আলো চাই, আলোয় থাকব, অন্ধকারে হাঁটব না, এ কে না জানে? কিন্তু কালো

সামিয়ানায় যে আলো ঢাকা, সে আলো পেতে কি সামিয়ানার ছাতে উঠব, না সামিয়ানার নিচে অন্ধকারে বসে তার গোড়ার বাঁধন কাটবার চেষ্টা করব।'

করবীদি কিছু না বলে হঠাৎ উঠে চলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে দিন্দা আর মলয় চোখে চোখে হেসে উঠল। সে হাসির অর্থ কি, জানি। দিন্দা তা 'ইনার সার্কেলের' মিটিং-এ একদিন বলেছিলেন, অনেক দিন আগে, করবীদি তখনো বাড়ী ছাড়েনি। আমি, মলয় আর দিন্দাই শুধু সে মিটিং-এ ছিলাম।

দিন্দা হেসে বলেছিলেন, 'করবীকে এমনিভাবে প্রকাশ্য পলিটিক্সে শরৎদা কেন নামাতে চাইছেন, তা বুঝিনে আমি? ওসব চালাকি আমার জানা আছে। আমি বলে দিচ্ছি, দেখো, বাড়ীর থেকে ও মেয়ের উপর এবার প্রেসার আসবে। নানারকম বুকনিতে ভুলিয়ে করবীকে আরো সামনে ঠেলে দেবে শরৎদা, করবীকে আরো স্বাধীনতা দেখাবে, তখন, ওদের যা বাড়ী, হাড় কনজারভেটিভ, দেবে তাড়িয়ে। মেয়ে বলে মানবে না গোঁসাইরা, ওদের ফ্যামিলিকে তো জানি! আর তারপর—অসহায়া বালা, এস পর মালা। ব্যস, হয়ে গেল শরৎদার পলিটিক্স্। করবীও সুট সুট করে ঘরকন্না করবে।'

মলয় সব থেকে বেশী চটে গেল। অ্যাঁ, এই নাকি শরৎদার মতলব? করবীদিকে বাগাবার জন্যই এত সব কাণ্ড!

বলল, 'মুখোশ খুলে দেওয়া উচিত এইসব ব্ল্যাকশিপদের। ভণ্ড, স্কাউণ্ড্রেল।'

দিন্দা বললেন, 'মলয়, সময় না আসা পর্যন্ত কিছু করো না। অনেক ভেবে কাজ করতে হবে। করবীর তত দোষ নেই। ও তো সম্মোহিত। ওকে শরৎদার প্রভাব থেকে উদ্ধার করতে হবে। তারপর শরৎদার ব্যবস্থা। ওই করবীকে আমিই আনি এই পার্টিতে, ওকে এই পার্টিতেই থাকতে হবে।'

সেই দিনই দিন্দার পরামর্শ মতো ঠিক হলো, আমাদের একটা দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ ভাণ্ডার খুলতে হবে। শরৎদা প্রেসিডেণ্ট আর করবীদি সেক্রেটারী। সেটাও দিন্দার প্রস্তাব।

দিন্দা বললেন, 'আর এদের উপর নজর রাখবার জন্য একজনকে চাই, একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী। কাকে এই ভারটা দিই ভাবছি।'

দিন্দা আমাদের মুখের দিকে চাইলেন। তারপর মলয়কে বললেন, 'মলয়, এ ভার তোমাকে দিলাম। হুঁসিয়ার হয়ে কাজ করবে।'

মলয়ের চোখ হিংস্র উল্লাসে দপ করে জ্বলে উঠল।

বলল, 'পার্টির জন্য সব পারি দিন্দা।'

মিটিং থেকে বেরিয়েই দেখি বেশ নির্জন হয়ে গেছে। রাত প্রায় সাড়ে দশটা হবে।

হাসপাতাল ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে আসতেই মলয় বললে, 'ঐ ছ্যাখ শরৎদা।'

আবছা দেখা যাচ্ছে চেহারাটা। তবে হাঁটার ভঙ্গীটি দেখে শরৎদাকে বেশ চেনা যায়। অমন দুলে দুলে, সামনে ঝুঁকে এই শহরে একা শরৎদাই হাঁটেন।

চোখাচোখি হতেই শরৎদা আমাকে বললেন, 'ওহে, কোথায় গিয়েছিলে, তোমার ওখান থেকেই আসছি।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন ?'

'আর বলো কেন, করবী এসে হাজির রাত প্রায় আটটার সময়। ওকে ওর বাবা তাড়িয়ে দিয়েছেন।'

বুকটা ধ্বক করে উঠল। দিন্দা কি হাত গুনতে জানেন ?

'সত্যি ?' কথাটা বেরিয়ে যেতেই চমকে উঠলাম।

শরৎদা বললেন, 'হ্যাঁ। ওর বাবার কাছে গিয়েছিলাম। কথাই বললেন না। ভয়ানক গোঁড়া ওঁরা। ও তোমাদের ওখানেই উঠল আজ রাত্রের মতো।'

শরৎদা চলে যেতেই দিন্দা আর মলয় চোখে চোখে চেয়ে হাসল। অর্থপূর্ণ হাসি। দিন্দার দূরদৃষ্টি দেখে আমি থ। হঠাৎ মলয়ের চোখ ধক ধক করে জ্বলে উঠল।

দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'এসব চলবে না এখানে।'

বাসায় ফিরে দেখি করবীদি দিব্যি মা'র সঙ্গে জমিয়ে নিয়েছে। হাসি ঠাট্টা গল্পে বাড়ী একেবারে জমজমাট। এত বড় একটা কাণ্ড যে ঘটে গেল তার জন্য করবীদির মুখে চোখে কোথাও এক ফোঁটা দুশ্চিন্তা নেই। যেন কিছুই হয়নি। যেন এইটেই করবীদির বাড়ী। হস্টেল থেকে পুজোর বন্ধে যেন ও এইমাত্র বাড়ী ফিরে এসেছে।

আমাকে দেখে হাসতে হাসতে উঠে এল। হাত ধরে এক ঝাঁকানি দিল।

তারপর করবীদি বলল, 'এতক্ষণে এলি। বাবা বাবা, ভাবলাম রাত্রে বুঝি আর ফিরবিই না। আমি সেই কখন এসে বসে আছি।'

করবীদি আবার জ্বলছে। ওর চোখ জ্বলছে, ওর ঠোঁট নাক চিবুক দিয়ে আভা বেরুচ্ছে, সেই সেদিন ভোরের মতো। ওর ভেতরে যে প্রবল উদ্দীপনা জেগেছে, এ তারই আলো, যে প্রবল প্যাশন করবীদিকে চালিত করছে, এ তারই দীপ্তি। মনে হলো করবীদির এ উচ্ছ্বাস ওর সহজাত, এ ওর উপচে পড়া জীবনীশক্তি। তার সামনে পড়ে কিছুক্ষণের জন্য আমার সংশয়, আমার সন্দেহ তলিয়ে গেল। খুশিতে মন ভরে উঠল। করবীদির হাতে জোরে এক ঝাঁকি দিলাম।

বললাম, 'ইনকিলাব!'

করবীদি খিল খিল হেসে ধরতাই দিল, 'জিন্দাবাদ।'

আর সঙ্গে সঙ্গে দিন্দার বিদ্রূপাত্মক ছড়াটা কানে বাজল। অসহায়া বালা, এস পর মালা। ভাবলাম, সত্যি দিন্দার আন্দাজ কত নির্ভুল। হয়তো গম্ভীর হয়ে থাকব।

করবীদির নজর পড়তেই বলে উঠল, 'কি রে, ভাবছিস কী?'

বললাম, 'এর পর কি হবে তাই ভাবছি।'

করবীদি হাসল। বলল, 'স্বাধীন যে হয়েছি, স্বাধীন যে হতে পারি, তার প্রমাণ দেবার এই তো সময় এল। বাবা তার মেয়ের মনুষ্যত্বকে স্বীকার করতে চাইলেন না। যুক্তি মানলেন না। তাড়িয়ে দিলেন। তা বেশ কথা! সটান তোর এখানে চলে এলাম।'

তারপর একটু ঠাট্টা করে বলল, 'ভয় নেই, তোর এখানে বেশীদিন থাকব না।'

'তা জানি,' আর পারলাম না, গলায় ব্যঙ্গ বাসা বাঁধল, বললাম, 'থাকবে না তা জানি।'

বলেই অপ্রস্তুত হলাম। করবীদিও বোধ হয় অবাক হলো।

বলল, 'কি জানিস?'

সামলে নিলাম।

হেসে বললাম, 'সবাই যা জানে আমিও তাই জানি। কারও গলগ্রহ হয়ে থাকা তোমার চরিত্র নয়।'

করবীদির মুখে আবার হাসি ফুটল। দিন পাঁচেক ছিল করবীদি আমাদের বাসায়। তারপর ওর মাসির বাসায় উঠে গেল।

মলয় যে সেদিন শরৎদাকে অমন অপমান করে বসবে তা ভাবিনি। ওর রাগ একদিন প্রকাশ পাবে মনে মনে তা জানতাম। কিন্তু তা যে এত শিগ্‌গির, আর এমন অভদ্রভাবে, তা ভাবিনি।

করবীদি ক'দিন একেবারে চুপ মেরে আছে। রামকৃষ্ণ আশ্রমের তুলনা শরৎদাকে ও দিতে চায়নি। ওটা হঠাৎ বেরিয়ে এসেছিল ওর মুখ থেকে। আর শরৎদাও যে সে সময় আবার ফিরে আসবেন তাও ও বুঝতে পারেনি। প্রথমটায় করবীদি খুব লজ্জায় পড়ল। পরে হলো অনুশোচনা। শরৎদার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবে, আমাকে দু-তিন দিন বলল। কিন্তু যেতে পারল না। শরৎদার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সাহসই পেল না করবীদি। করবীদি চুপ তো সঙ্গে সঙ্গে সব উৎসাহ, সবার উৎসাহই যেন ঝিমিয়ে এল। মাস পাঁচেক তো করবীদি আমাদের সঙ্গে কাজ করছে, এর মধ্যেই সকলের অজ্ঞান্তে

কেমন করে যে সে সব উদ্দীপনার কেন্দ্র হয়ে বসেছে তা বুঝতে পারিনি। দু-তিন দিন আসেনি করবীদি, মনে হচ্ছে যেন কতকাল আসেনি।

দুর্ভিক্ষ সাহায্য ভাণ্ডারের কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। আমরা একবার চেষ্টা করলাম টাকা তুলতে করবীদিকে ছাড়াই। মিটিং করলাম, ঝোলা নিয়ে এগিয়ে গেলাম, চাঁদাই উঠল না তেমন।

মলয় বলল, 'করবীদি থাকলে দেখতিস পয়সার বৃষ্টি শুরু হতো এতক্ষণে।'

শরৎদার জন্যেই করবীদি আসছে না বলে মলয়ের ধারণা।

'নিশ্চয়ই বারণ করে দিয়েছেন। আর কি, নিজের কাজটি তো হাসিল। এবার মালাটি পরিয়ে করবীদিকে ঘরে তুলতে পারলেই নিশ্চিন্ত। কি মতলববাজ, বল দেখি।'

এর মধ্যে একদিন শুনলাম, করবীদির বাবা দিন্দাকে ডেকে-ছিলেন।

দিন্দা বললেন, 'করবী যদি বাড়ী ফিরে যায় তো ওর বাবা আমাদের ইউনিটকে মোটা টাকা চাঁদা দেবেন বলে স্বীকার করেছেন। সেই টাকায় এখান থেকে অনায়াসে একটা সাপ্তাহিক বের করা যেতে পারে। ডিস্ট্রিক্টটাও অর্গানাইজ করে ফেলা যাবে।'

দিন্দা বললেন, 'করবীকে পলিটিকস্ ছাড়তে বলেননি ওর বাবা। তবে ঝাণ্ডা ঘাড়ে করে ওঁর চোখের সামনে এই শহরে ওঁর মেয়ে ঘুরবে এটা উনি সহ্য করবেন না। রাস্তাঘাটে বক্তৃতা দেওয়াও উনি পছন্দ করেন না। আমরা যদি করবীকে বুঝিয়ে রাজী করাতে পারি, তাহলে তিনি নিয়মিত আমাদের বেশ মোটা চাঁদা দিতে পারেন।'

ব্যাপারটা ভাল করে বিবেচনা করা দরকার। তাই একজি-কিউটিভ মিটিং ডাকা হলো। করবীদি সেদিনও এল না।

দিন্দা করবীদির বাবার প্রস্তাবটা বেশ গুছিয়ে মিটিং-এ তুললেন। করবীদির এই স্বার্থত্যাগটুকু পার্টির জন্য করা দরকার, দিন্দা সেটাও

বুঝিয়ে দিলেন।

বললেন, 'এতে লাভ ছাড়া ক্ষতি বিশেষ কিছু নেই। করবী একা যেটুকু কাজ করতে পারত, ওর বাবার টাকায় আমরা তার চেয়ে ঢের বেশী করতে পারব। পার্টি তহবিলে বেশী টাকা দিতে পারব, করবী বক্তৃতা দিয়ে যত লোককে বোঝাতে পারত, আমাদের জেলা অর্গান সাপ্তাহিক মারফত তার চেয়ে ঢের বেশী লোককে আমরা বোঝাতে পারব। আমার মনে হয় এমন অবস্থায় করবীর ফিরে যাওয়াই উচিত।'

দিন্দা, চুপ তো সবাই চুপ। মনে হলো বলি, করবীদি যদি আর অফিসে বসতে না পারে তো ওখানে বসবার উৎসাহ আমাদেরও কমে যাবে যে। কিন্তু সে কথা বলতে বাধোবাধো ঠেকল।

অবাক করল মলয়। করবীদিকে না দেখলে সেই ছটফট করে বেশী। আর ও কিনা দিন্দার কথাতেই সায় দিল।

শুধু শরৎদা এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করলেন।

বললেন, 'করবীকে ফিরে যাবার কথা বলতে আমরা পারিনে। সে নৈতিক অধিকার আমাদের নেই। আর কেনই বা ওকে ফিরতে বলব? ও একা যা কাজ করেছে এই শহরে, আমরা তার সিকিও করতে পারিনি। যে কাজগুলো করবীর স্বাধীনতার স্মারক, আমরা ওর বাবার প্ররোচনায় পড়ে সেগুলোই ওর কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইছি। ঝাণ্ডা ঘাড়ে করে কোনো মেয়ে এই শহরে রাজনৈতিক প্রোসেশনে যোগ দিতে পারে, কার কল্পনায় এটা ছিল? করবী দেখিয়েছে তা সম্ভব। এই শহরে নারীদের মুক্তি আন্দোলন যদি কোনো দিন সম্ভব হয়, সেদিনের মেয়েরা প্রেরণা পাবে আজকের এই করবীর কাছ থেকে। আমরা যদি নারী-পুরুষের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, যদি প্রত্যেকের বাক্-স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, তবে পথে-ঘাটে করবীর বক্তৃতা দেওয়ার অধিকার কেড়ে নেবার চেষ্টা করছি কেন?'

দিন্দা ব্যঙ্গ করে বললেন, 'শরৎদার কথা শুনতে সব সময়ই ভাল

লাগে। কিন্তু বিপ্লবীরা প্রয়োজন অনুসারে পন্থা বদলায়। শরীরের মাপে কোট বানাতে হয়। সেন্টিমেণ্টের কথা বাদ দিন। ব্যাপারটা সাদা চোখে দেখুন। আমি পার্টির সভ্য। আমি আছি আর পার্টি আছে। দেখতে হবে আমাকে দিয়ে পার্টির ম্যাক্সিমাম বেনিফিট কিভাবে হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, করবী ফিরে গেলেই বেশী লাভ পার্টি পাচ্ছে। তাই তাকে ফিরে যেতে হবে।'

শরৎদা বললেন, 'এ সুবিধাবাদ। এ দিয়ে বিপ্লব করা যায় কি না জানিনে, তবে এ দিয়ে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না।'

মলয় বলল, 'শরৎদা কি বিপ্লব আর স্বাধীনতা আলাদা বলে চালাতে চান?'

'আমি কেন চালাতে চাইব?' শরৎদা বললেন, 'ও দুটো গোড়াগুড়িই আলাদা। সেই কথাটাই তো বলতে চাইছি। স্বাধীনতা উঁচু ডালের ফল নয়। কোনো দূর গোপনস্থানে তা অপেক্ষা করে নেই কারো জন্য। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমরা স্বাধীন হচ্ছি একটু একটু করে, আবার স্বাধীনতা বিসর্জনও দিচ্ছি।'

মলয় বলল, 'তার মানে বলতে চান, আমরা স্বাধীন?'

শরৎদা বললেন, 'পুরো নয়, তবে কিছুটা তো বটেই। মানুষের মধ্যে যে অফুরন্ত সম্ভাবনা আছে তার পরিপূর্ণ বিকাশই তো স্বাধীনতা। তার বিকাশ লাভের পথে যে সব বাধা, নানা ধরনের অন্তরায়—রাজনৈতিক অন্তরায়, অর্থনৈতিক অন্তরায়, আত্মিক অন্তরায়—তা দূর করাই তো স্বাধীনতার সংগ্রাম। বিপ্লব সেই সংগ্রামের অসংখ্য হাতিয়ারের মধ্যে একটা মাত্র।'

'তাহলে আপনি করবীকে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করবেন না?' দিন্দা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন।

শরৎদা বললেন, 'আমার তা করবার কোনো অধিকার নেই।'

মলয় হঠাৎ বলে বসল, 'তা থাকবে কেন? তাহলে যে

মতলবাচ হাসল হবে না।'

শরৎদা অবাক হয়ে গেলেন। 'তার মানে?'

'মানে বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না, মশাই। আপনার মতলব সবাই ধরে ফেলেছে। করবীদি বাড়ীতে না গেলেই আপনার খুব সুবিধে। অসহায়া বালার গলায় মালাটি পরিয়ে দিয়ে বরণ করে ঘরে তুলতে আর বাধা থাকবে না।'

মলয় প্রবল হিংসায় থরথর করে কাঁপছে। প্রচণ্ড আক্রোশে ওর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে! এই আকস্মিক অপমানে শরৎদার বাক্‌রোধ হয়ে গেছে। দিন্দা চুপ করে বসে মলয়কে লক্ষ্য করছেন। কি জানি চোখের সামনে শরৎদার এই অপমান আমার সহ্য হলো না। আমি জানি শরৎদা কি, মলয় জানে না। কিন্তু দিন্দাও কি জানেন না শরৎদাকে? মলয় কি বলতে যাচ্ছিল আবার। ওকে ঠেলে ঘর থেকে বের করে দিলাম।

শরৎদা, দিন্দা আর আমি বসে থাকলাম চুপ করে। কারো দিকে চাইনি, চাইতে পারিনি। ঘরের স্তব্ধতার আড়ালে আমরা লুকোতে চাইছিলাম। আমি ঢাকতে চাইছিলাম আমার লজ্জা আর শরৎদা বোধ হয় অপমান। দিন্দা শুধু স্থির দৃষ্টিতে শরৎদার দিকে চেয়েছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে, ঠিক কতক্ষণ পরে মনে নেই, হয়তো আধ ঘণ্টা, হয়তো দু'ঘণ্টা, শরৎদা যেন চেতনা ফিরে পেলেন। রক্তশূন্য মুখে এক ঝলক রক্ত এসে গেল। ধীরে সুস্থে উঠলেন। ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন। আমিও উঠছিলাম।

দিন্দা বসতে বললেন। বসলাম।

বললাম, 'মলয় শরৎদার সঙ্গে অভদ্রের মতো ব্যবহার করেছে।'

দিন্দা বললেন, 'যত সব ছেলেমানুষি। দু'দিন করবীর সঙ্গে ঘুরেছে কি অমনি শরৎদার উপর জেলাসি হয়েছে।'

ঠাট্টা করলেন, 'ইটারন্যাল লভ্ ট্র্যাঙ্গেল। পার্টিটা থিয়েটারের

স্টেজ হয়ে উঠল দেখছি।'

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে দিন্দা বললেন, 'কিন্তু এসব চলবে না। এই নাটক দেখবার জন্য পার্টির সৃষ্টি হয়নি। ডিসিপ্লিন, স্ট্রিকট্ ডিসিপ্লিন চাই।'

'শোনো কমরেড', দিন্দা যেন নির্দেশ দিচ্ছেন কোনো এক উঁচু আসন থেকে, 'মলয়কে ক্ষমা চাইতে হবে। কাজটা খুব অন্যায় করেছে তা বলছিনে, সেজন্য নয়, শরৎদাকে আমরা বর্তমান অবস্থায় ছাড়তে পারিনে, শরৎদা গেলে করবীও যাবে।'

'কিন্তু দিন্দা,' বললাম, 'মলয় যদি ক্ষমা না চায়!'

এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে দিন্দা জবাব দিলেন, 'তাহলে, শৃঙ্খলাভঙ্গ এবং নেতার প্রতি অশোভন আচরণ, এই দুই অপরাধের জন্য তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। পার্টি ইজ্ পার্টি।'

এই হলো পার্টি। অথচ একটু আগে পর্যন্তও আমার ধারণা ছিল, মলয় দিন্দারই ডান হাত।

দিন্দা বললেন, 'আশা করি মলয়ের উপর তোমার কোনো দুর্বলতা নেই।'

'না না', দিন্দার চাউনি দেখে শঙ্কিত হলাম।

'তবে', দিন্দা বললেন, 'যদি দরকার হয়, মলয়ের বহিষ্কার প্রস্তাবটি তোমাকে আনতে হবে। কি, পারবে তো?'

'নিশ্চয়ই', হাসি হাসি মুখ করে তৎক্ষণাৎ বললাম, 'কমরেড, পার্টির জন্য সব পারি।'

সেই মুহূর্তে একবার শুধু মনে পড়ল, মলয় আমার বন্ধু। ওকে আমিই পার্টিতে এনেছিলাম।

করবীদিকে খবরটা দিতে গিয়েছিলাম। দিন্দা ঠিক করেছিলেন, শরৎদার বাসাতেই মিটিংটা হবে। আর করবীদি যাতে সেই সভায় হাজির থাকে সে চেষ্টা করতে দিন্দা আমাকে বিশেষ করে বলেছিলেন।

করবীদির বাসায় গিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না। করবীদির ঘরটাও অন্ধকার। উঁকি মেরে অবাক হলাম। করবীদি চেয়ারে বসে আছে, টেবিলে মাথা ঠেকিয়ে। ঘরে ঢুকতেই মনে হলো, যেন চমকে উঠল। খুট করে আলো জ্বেলে আমাকে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলল করবীদি।

বলল, 'ও তুমি!'

আমাকে 'তুমি' বলাতে বিস্মিত হলাম।

করবীদির গলাটা ধরা ধরা, চোখ দুটো ফোলা ফোলা। বুঝলাম, কাঁদছিল। তবে কি করবীদি ব্যাপারটা জেনে গেছে!

খুব শীতল চোখে আমার দিকে চেয়ে করবীদি জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার, তুমি আবার এসেছ কেন? আবার কি বলতে চাও, কি করতে চাও? তোমরা কি আমাকে একটুও রেহাই দেবে না।'

কিছু একটা গভীরতর ঘটেছে। করবীদিকে অপ্রকৃতিস্থ ঠেকল। করবীদির এমন চেহারা, আমি এর আগে আর দেখিনি। যে মেয়ে সদা উজ্জ্বল, প্রাণের জোয়ারে আশপাশ ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তার এ কি অবস্থা!

আজ করবীদিকে দেখে কে বলবে, বাড়ী থেকে প্রকাশ্য ভাবে পার্টি করবার অপরাধে বিতাড়িত হবার পর, এই মেয়ে একদিন আমাদের সঙ্গে শোভাযাত্রায় বেরিয়েছিল। লুকিয়ে চুরিয়ে নয়, পিছনে পিছনে নয়, একেবারে সবার সামনে পতাকা ঘাড়ে করে, ধ্বনি করে করে। আরও অবাক করেছিল, ওদের পাড়ায় গিয়ে চৌমাথায় দাঁড়িয়ে যখন বক্তৃতা দিল। লোক ভেঙ্গে পড়ল চারদিকে। টিটকারি, বিদ্রূপ চারধার থেকে অজস্র বর্ষিত হলো। কে যেন একটা ছোট্ট ঢিল করবীদির মাথায় ছুঁড়ে মারল। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না করবীদি। কোনো দিকে চাইল না। অবিচল বক্তৃতা দিয়ে গেল। আর আজ তাকে এ কি দেখছি!

এতদিন করবীদিকে আমার একবারও কেন মেয়ে বলে মনে

হয়নি, ভেবে আশ্চর্য লাগছে। আজ বিপর্যস্ত করবীদিকে দেখে মনে হলো, সে-ও মেয়েই। কিন্তু আশ্চর্য মেয়ে।

করবীদিকে আজ আর গ্রাহ্য করলাম না। ওর কাছে এগিয়ে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'করবীদি, কি হয়েছে?'

করবীদি আমার দিকে চাইল। আন্তরিকতার ছোঁয়ায় ওর চোখে জল নামল। কোনো কথা না বলে, বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। উপুড় হয়ে বালিসে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

ফাঁকে ফাঁকে বলতে লাগল, 'কেন তোরা ওঁকে এ অপমান করলি। এ তো মিথ্যে, একেবারে। শরৎদা আমাকে বিয়ে যদি কবতে চাইতেন, কে রুখতে পারত? আর আমি কি শরৎদার যুগ্যি? তাহলে কি শরৎদা বার বার আমাকে ফিরিয়ে দিতেন? জেল থেকে ফেরবার পর ওঁর শরীর বার বার ভেঙ্গে পড়েছে, থাকেন তো একলা একখানা ঘর নিয়ে, ওঁর বাবা কতবার সাধাসাধি করেছেন, শরৎদা যাননি, নিজে হাতে সব কাজ করে গেছেন, সে কাজে সাহায্য করতে গেছি বাধা দিয়েছেন, সেবা করতে গেছি বিদ্রূপ করেছেন, লজ্জার মাথা খেয়ে আমিই প্রস্তাব দিয়েছি বিয়ের। বলেছেন, আবার যদি এ প্রস্তাব তুলেছি তো আমার মুখ দর্শন করবেন না। রাজনীতিটা যৌটক বাধবার জায়গা নয়। সেই লোককে তোরা এমনভাবে অপমান করলি?'

বললাম, 'মলয় শেষ পর্যন্ত এই ব্যবহার করবে ভাবিনি।'

করবীদি চট করে উঠে বসল বিছানার উপর। চোখ দুটো ধ্বক করে জ্বলে উঠল।

বলল, 'মলয় নয়, এ ব্যবহার কার তা জানি, বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এতে তোরও তো সায় ছিল? দিন্দা ছিল না সেখানে?'

তীব্র জ্বলজ্বলে চোখে করবীদি আমার দিকে এমনভাবে চাইল যে, আমি কুঁকড়ে গেলাম।

ঘুরিয়ে জবাব দিলাম, 'আমি মলয়কে বের করে দিয়েছিলাম।

তুমি শরৎদাকে জিজ্ঞাসা করো।'

করবীদি একটু কোমল হলো।

বলল, 'কাউকে জিজ্ঞাসা আর করতে হবে না। মলয় নিজেই সব জানিয়েছে। ঐ যে তার চিঠি। সে আর এখানে থাকবেই না।'

'সে কী, কোথায় গেল?' আশ্চর্য হলাম।

করবীদি বলল, 'তা জানায়নি।'

তারপর থেকেই কেমন এক চাপা রেষারেষি শুরু হলো দিন্দা আর করবীদির মধ্যে। প্রথম প্রথম দিন কতক করবীদি গা এলিয়ে দিয়েছিল। ভেবেছিলাম, বোধ হয় এবার বিদায় নেবে রাজনীতি থেকে। কিন্তু ভুল বুঝেছিলাম। করবীদি ফিরে এল, দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে। কিছুই তাকে দমাতে পারলে না। পার্টির প্রয়োজনে শরৎদাকে ওঠানো হলো, প্রয়োজন ফুরালে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হলো। জীবন থেকেই সরে গেলেন শরৎদা। কিছুতেই যেন করবীদির আর কিছু এল গেল না। এ সব কোনো ঘটনাই যেন তার মনে রেখাপাত করল না। করবীদি জানতে পেরেছিল, পার্টি পলিটিক্স্ বুনো ঘোড়া, পিঠের উপর চেপে থাকতে পার যদি তবেই তোমার গতি। পিছলে পড়লে আর রক্ষা নেই। দিন্দার যেখানে জোর করবীদি সেইখানেই এবার হাত বাড়াল। করবীদি বুঝল, বিপ্লবী হলেই হবে না, পার্টিকে হাতের মুঠোয় রাখতে হবে।

দিন্দা, যিনি কাউকে পরোয়া-টরোয়া করেননি, বিপ্লবের ভৈরবী সাধনায় যাঁর গতি ছিল স্থির, আত্মবিশ্বাস ছিল দুর্জয়, লক্ষ্য করলাম, করবীদিকে ভয় করতে শুরু করেছেন। এতদিনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দিল বুঝি। তাও কে, না করবী। কিন্তু তুচ্ছ করবার মতো অবজ্ঞা করার মতো মেয়ে করবী নয়।

বুঝতে পারলাম, এক প্রচ্ছন্ন অথচ তীব্র বিদ্বেষের আগুনে দু'জনে জ্বলছে। দিন্দা আর করবীদি ঘৃণার অদৃশ্য ধারালো তরোয়াল হাতে যেন ছিদ্র খুঁজছে পরস্পরের।

গোড়ার দিকে আমাদের পার্টি পলিসি বদলাল। 'গোপন কোটর' ছেড়ে বেরিয়ে আসবার নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় কমিটি। হুকুম হলো 'মাস্ কন্‌ট্যাকটের'। গণ-সংযোগ, এই হলো শ্লোগান।

আগের দিন পর্যন্ত দিন্দা বক্তৃতা দিয়েছেন, একশটা কাঠের টুকরোর চেয়ে একটা দেশলাই-এর কাঠির ক্ষমতা বেশী—সেই একটা কাঠিই পারে খাণ্ডবদাহন করতে।

দিন্দা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেননি পার্টির এত বড় পরিবর্তনের কথা। একটু আগেও যদি খবরটা পেতেন তো সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বদলে নিতে পারতেন। এর আগে, পার্টির পলিসি যে কয়বার বদলেছে, দিন্দারও বদল হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু এবার দিন্দার চোখ ছিল করবীদির দিকে, আর করবীদির চোখ ছিল কমরেড ভুবন চাকলাদারের উপর। এখন কমরেড ভুবন চাকলাদার মানেই পার্টি। কারণ তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক। চাবিকাঠি তাঁর হাতে। কলকাতা থেকে এসেছেন, লোকাল পার্টির সঙ্গে আলোচনা করার জন্য। নতুন থিসিস নিয়ে আলোচনা শুরু হতেই দিন্দা পাশ কাটাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু করবীদি ছাড়েনি। দিন্দাকে ধীরে ধীরে উস্কে উস্কে একেবারে আলোচনার মধ্যে ফেলে দিল। দিন্দা প্রাণপণে এই আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসতে যত চেষ্টা করেন, সময় নেবার ফিকিরে থাকেন, করবীদি তত তাঁকে ঠেলে দেয় সামনে। কমরেড চাকলাদার ততই তাঁকে রোমান্টিক, সেকেলে ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়া বিপ্লবী বলে উপহাস করেন। আর করবীদির চোখে মুখে উল্লাসের তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। দিন্দা একবার আমাদের সকলের দিকে আর একবার করবীদির দিকে তাকান, নিতান্ত অসহায়ভাবে তাকান। দিন্দার চোখে আত্মবিশ্বাসের সে তেজ আর নেই, তা অনেক স্তিমিত হয়ে এসেছে।

শেষে মিনমিন করে বললেন, 'আচ্ছা ভেবে দেখি।'

করবীদি এইবার আমাদের সকলকে আহ্বান করে বললে, 'কমরেডস্, আজ যখন কাজ করবার সময় এসেছে, কর্মসূচীও তৈরী, তখন ভেবে দেখার নাম করে নিষ্ক্রিয় থাকাটা পার্টির নতুন থিসিস সমর্থন না করারই নামান্তর বলে আমি মনে করি। বিশেষ করে সামনেই যখন পার্টির প্রথম প্রকাশ্য সম্মেলন, তখন একটি দিন নিষ্ক্রিয় থাকাও কি ভয়ঙ্কর অপরাধ তা আশা করি সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। যদিও জানি পার্টিকে যারা ভালবাসে তাদের সকলের কাছেই এই নতুন থিসিস গ্রহণীয় হবে, তবু আমরা আমাদের এই বিশিষ্ট কমরেডকে, যিনি কলকাতা থেকে এসে আমাদের ধন্য করেছেন, দেখিয়ে দিতে চাই, আমাদের এই স্থানীয় ইউনিটটি ক্ষুদ্র হলেও পার্টির মহান আদর্শে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে কারোর পিছনে পড়ে থাকবে না। যাঁরা আমাদের নতুন আদর্শে বিশ্বাসী, মনে প্রাণে যাঁরা এই আদর্শ গ্রহণ করেছেন, তাঁরা হাত তুলুন।'

ঘর ভর্তি সভ্যদের হাত উঠল। শুধু দিন্দা নিশ্চল। ঘর ভর্তি সভ্যের কণ্ঠে আওয়াজ উঠল, ইনক্লাব জিন্দাবাদ। শুধু দিন্দা নিশ্চুপ। চার বছর ধরে দিন্দার সঙ্গে আছি। তাঁর এতবড় পরাজয় আর হয়নি, দেখিনি, হতে পারে সে বিশ্বাস ছিল না। দিন্দা মুখ নীচু করে বসে থাকলেন, মুখ নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

করবীদির দিকে তাকিয়ে দেখি তার সর্বশরীর জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।

সেই করবীদিই আবার দিন্দার প্রেমে পড়ল। দিন্দাও। আশ্চর্য। মজিলপুরের সম্মেলনে যদি মারামারিটা না হতো তবে এ ঘটনা ঘটত কিনা সন্দেহ।

তিন দিন ধরে অধিবেশন হলো। এত লোক হবে ভাবিনি। অনেক ডেলিগেট এসেছিল। লীডাররা এসেছিলেন। আর শেষ দিনের প্রকাশ্য অধিবেশনে এসেছিল চাষীরা। চব্বিশ পরগণার কমরেডদের সাবাস দিই সেই জন্য। কি সংগঠন! প্রায় পঁচিশ হাজার চাষী এসেছিল সেদিনকার সভায়।

তখন আগস্ট বিপ্লব ছড়িয়ে পড়েছে দেশে। আমরা আগস্ট বিপ্লব সমর্থন করিনি। সেই সম্পর্কে কয়েকজন নেতা সভায় বক্তৃতা করেন। বলা বাহুল্য, ওটাকে তুড়ে গালাগাল দেওয়া হয়।

মজিলপুরে আগস্ট আন্দোলনের সমর্থক ছিল প্রচুর। তারা তলে তলে আমাদের সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু এই প্রবল জনস্রোত সভায় আসতে দেখে তারা কিছু করতে ভরসা পায়নি।

সন্ধ্যার মুখে সভা ভেঙ্গে গেল। অধিকাংশ ডেলিগেট, নেতারা, মালপত্র একে একে স্টেশনে চলে গেল। আমরা দেরী করতে লাগলাম করবীদির জন্য। আমরা বাইশজন এসেছিলাম ডেলিগেট হয়ে। দিন্দাও ছিলেন। শেষ পর্যন্ত দিন্দা ওঁর ভুল স্বীকার করে নতুন থিসিস মেনে নেন। আর সম্মেলনের জন্য খেটেছিলেনও প্রচুর।

তবে করবীদি যা পরিশ্রম করল, তার তুলনা মেলা ভার। সম্মেলনে কিচেনের ভার ছিল করবীদির উপর। এমন সুন্দরভাবে করবীদি সব দিক সামাল দিল যে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। তাকে প্রাদেশিক কমিটির সদস্য করে নেওয়া হলো।

কিচেনের সব জিনিস স্থানীয় কমরেডদের হাতে বুঝিয়ে দিতে সন্ধ্যে ঘোর হয়ে এল। বিদায়-টিদায় নিয়ে স্টেশনের দিকে পা বাড়িয়েছি, আমরা প্রায় জনা পঞ্চাশেক এক দলে ছিলাম, আর হৈ হৈ করে মারপিট শুরু হয়ে গেল। মুহূর্তে কে যে কোথায় ছিটকে পড়ল জানিনে। দেখি, অবিশ্রান্ত ইঁট-পাটকেল বর্ষণের

মধ্যে আমরা জন ছয়-সাত দাঁড়িয়ে আছি করবীদিকে ঘিরে।

অন্ধকার ঘুরঘুট্টি। অচেনা জায়গা। মাঝে মাঝে পথের মোড় থেকে, ঝোপের আড়াল থেকে, বাড়ীর কোণ থেকে টর্চের আলো এসে পড়ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ইঁট, ডাব এসে পড়ছে আমাদের উপর। সেই ভয়াবহ তাণ্ডবের বর্ণনা হয় না। আমাদের সর্বশরীর থেঁতলে গেল। মাথা. হাত, কপাল কারও না কারও ফাটলই। ভয় হচ্ছিল করবীদিকে নিয়ে। বেশ ঘাবড়ে গিয়েছে করবীদি। এ অভিজ্ঞতা ওর ধারণার বাইরে ছিল। অন্ধকারের মধ্য থেকে হঠাৎ দিন্দা এগিয়ে এলেন। লক্ষ্য করিনি কখন যেন পেছিয়ে গিয়েছিলেন। করবীদিকে আড়াল করে দাঁড়ালেন।

বললেন, 'দাঁড়িয়ে লাভ নেই, এগিয়ে চল।'

টর্চের আলো করবীদির উপর পড়তেই কে যেন চেঁচাল, 'ওরে মেয়েমানুষ।'

আরেক কণ্ঠ বললে, 'মার শালীকে। লুঠ কর।'

দিন্দা চট করে করবীদিকে আড়াল করে দাঁড়াতেই একটা ডাব এসে তাঁর পিঠে পড়ল। কিছুক্ষণ দম বন্ধ করে থাকলেন দিন্দা।

তারপর বললেন, 'এগোও, বাঁ দিকে মাঠ, তারপরেই রেল লাইন। ভয় নেই করবী। তুমি আমার হাত ধরো।'

সঙ্গে সঙ্গে একটা আধলা ইঁট দিন্দার কোমরে এসে পড়ল। দিন্দা যন্ত্রণায় অব্যক্ত এক শব্দ করলেন। তারপর কঁকিয়ে বলে উঠলেন, 'ভয় নেই করবী, এগিয়ে চল।'

আমরা মরিয়া হয়ে উঠলাম। লাহিড়ী বলল, 'দিন্দা, আমরা খানিকটা সামলাচ্ছি, আপনারা এগিয়ে যান।'

তারপর শুরু হলো দু-পক্ষে ইঁট ছোঁড়াছুঁড়ি! দু-পক্ষেই ঘায়েল হলো বেশ।

সব চেয়ে অবাক করল পুলিশ। পুলিশের আড়াল থেকে ইঁট

মেরে ওরা আমাদের ছাতু বানাবার যোগাড় করে তুলল, আর পুলিশগুলো দিব্যি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল।

কি করে যে সেদিন স্টেশনে পৌঁচেছিলাম জানিনে। স্টেশনের আলোয় চেয়ে দেখি সর্বনাশ, জনা পঁচিশেক একেবারে রক্তে ভাসছে। সার সার পড়ে আছে প্লাটফর্মে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা দিন্দার। তাঁর সর্বাঙ্গ থেঁতলে গেছে। চাপ চাপ রক্ত সর্বদেহের এখানে ওখানে জমে আছে। চোখ বুঁজে নিশ্চল শুয়ে আছেন। ফেট্টি বাঁধা রক্তাক্ত মাথাটা করবীদির কোলের উপর। করবীদি নিষ্পলক চেয়ে আছে দিন্দার দিকে।

ট্রেন এলে যত্ন করে একটা সেকেণ্ড ক্লাসে তোলা হলো দিন্দাকে। একজন ডাক্তার, করবীদি আর আমি উঠলাম। অযথা ভিড় বাড়তে আর দেওয়া হলো না।

সারাপথ যে কিভাবে এসেছি, আমিই জানি। আমার নিজের গায়ে গতরে দারুণ ব্যথা। তবু সব ছাপিয়ে দিন্দার কথাই মনে পড়ছিল। দিন্দার বরাবরকার সঙ্গী একমাত্র আমিই আছি। মনে পড়ে বহুদিন আগে দিন্দাকে এমনি কাহিলভাবে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। যখন ওঁর টাইফয়েড হয়েছিল। তার মধ্যেও দিন্দা কাজের কথা ছাড়া কিছু বলেননি।

এইদিনও দেখলাম তাই। হঠাৎ একবার জ্ঞান হলো।

জিজ্ঞাসা করলেন, 'করবী, তুমি সেফ্?'

করবীদি বলল, 'হ্যাঁ।'

দিন্দা আবার চোখ বুঁজলেন।

করবীদি বলল, 'স্টেশনে পৌঁছেও এই কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন। সারাটা পথ কি মারই না খেয়েছেন, কিন্তু একটু উঃ কি আঃ কিছু করেননি।'

ট্রেনে আসতে আসতেই করবীদি দিন্দার সম্পর্কে অনেক কথা বলেছিল। আমি সেগুলি জানতুম না।

দিন্দা ওদের আত্মীয় হন যেন কি রকম।

সেই সুবাদে দিন্দা দিনকতক ওদের বাড়ীতে থেকে পড়েছিলেন। সেই সময় করবীদির দিন্দাকে বড় ভাল লাগে। প্রথম প্রথম দিন্দা করবীদিকে আমল দিতেন না। নিস্পৃহ থাকতেন। কিন্তু দিন্দার মধ্যে কোথায় যেন একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। যার টানে করবীদি বার বার এগিয়ে এসেছে। হঠাৎ দিন্দা জেলে গেলেন। খালাস পেয়ে বছর দেড়েক বাদে ফিরেও এলেন। কিন্তু করবীদিদের বাড়ীতে আর উঠলেন না। উঠতে চাইলেও পারতেন না। সে দরজা দিন্দার কাছে জেল থেকেই বন্ধ হয়েছিল।

করবীদি বললে, 'দিন্দা যে জেল থেকে ফিরেছেন তা জানতামও না। হঠাৎ কলেজের পথে একটা খাবারের দোকানের কাছে দিন্দার সঙ্গে দেখা। বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে। কয়েদীদের মতো। আমি কিছু না বলেই পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলাম। কথা হয়তো বলতামও না। হঠাৎ নজরে পড়ল, এক ঠোঙ্গা মুড়ি কিনে দিন্দা গোগ্রাসে গিলছেন। ঐ খাওয়ার রকম দেখেই দাঁড়িয়ে গেলাম। যেতে পারলাম না। মনে হলো দিন্দা নিশ্চয়ই দিন দুয়েক খেতে পাননি। এগিয়ে গিয়ে ডাক দিলাম।'

দিন্দা করবীদিকে দেখে প্রথমটা খুশি হননি। সাড়াও দেননি। একবার দেখেই মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন। লজ্জায় অপমানে লাল হয়ে করবীদি সেদিন কলেজে গেল।

'কিন্তু অবাক হলাম দিন দুয়েক বাদে,' করবীদি বলল। 'বুঝলি, হঠাৎ কমন রুমে এক চিরকুট পাঠালেন দিন্দা, দেখা করতে চান। একবার ভাবলাম ফিরিয়ে দিই। কিন্তু পারলাম না। সেদিন দেখা করলাম। টাকা চাইলেন কিছু, টাকা দিলাম।'

কিন্তু আশ্চর্য, দিন্দা একটা টাকা কখনো নিজের জন্যে খরচা করেননি। যেমন অভুক্ত, অর্ধভুক্ত থাকতেন, তেমনি কাটাতে লাগলেন। অথচ করবীদি দিন্দাকে নিয়মিত টাকা দিয়ে গেছে।

করবীদি বলল, 'মাসে একশ' দেড়শ' টাকাও দিয়েছি। কিন্তু দিন্দা যে-কে-সেই রয়ে গেলেন। দেখলেই মনে হতো যেন না খেয়ে আছেন। প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল, থাক, নাই বা জিজ্ঞাসা করলাম, কি করেন টাকা নিয়ে। কিন্তু পারলাম না। একদিন জিজ্ঞাসা করতেই দিন্দা বললেন, হিসেব চাও? লজ্জা পেয়ে, থতমত খেয়ে বললাম, না না, তা কেন? তারপর অনেক ঢোঁক-টোক গিলে বললাম, খাওয়াদাওয়া করেন বলে মনে হয় না, তাই ওকথা জিজ্ঞেস করলাম।'

দিন্দা বলেছিলেন, 'খাবার মতো পয়সা রাখতে বিবেকে বাধে। আমার উপর পার্টি যে ক'টা টাকা তোলার ভার দিয়েছে তাই তুলতে পারিনি।'

'সেই প্রথম পার্টির কথা শুনলাম। তারপর তো ধীরে ধীরে পার্টির সভ্যই হলাম।' করবীদি বলে যেতে লাগল, 'এমন কোনো কাজ নেই, ক-বছর ধরে দিন্দা আমাকে দিয়ে যা না করিয়েছেন। আশ্চর্য, দিন্দার মনে কোনো পাপবোধ নেই। খারাপ কাজ বলে কিছু নেই। পার্টির জন্য যা করা যায় তাই ভাল কাজ। কিন্তু আমার মন তো দিন্দার মতো অত শক্ত সবল নয়। আমি ভয় পেতাম। আতঙ্ক হতো। দিনে দিনে অন্ধকার যেন গ্রাস করতে লাগল আমায়। পরিত্রাণ চাইতাম, পারতাম না। দিন্দার চৌম্বক ব্যক্তিত্ব আমার অন্তরাত্মার বিদ্রোহকে গলা টিপে টিপে দমন করত। শেষ পর্যন্ত মুক্তির জন্যে, আলোর জন্যে, সদর পথে হাঁটার জন্যে কাঙাল হয়ে উঠলাম। হয়তো পারতাম না। হয়তো চিরদিন অন্ধকারকেই আঁকড়ে থাকতে হতো। দিন্দাকে এড়াতে পারতাম না বলেই ঘৃণা করতে শুরু করেছিলাম, প্রবল ঘৃণা। সেই দিন্দার ছায়াতেই হয়তো জীবন কেটে যেত।'

করবীদি একটু থেমে তারপর বলল, 'যদি না শরৎদাকে পেতাম।'

'করবী', দিন্দা ডাক দিলেন।

ট্রেন হুইসেল্ দিল। করবীদি চমকে চাইল দিন্দার দিকে।

'করবী, তুমি সেফ্ ?'

করবীদি অসীম মমতায় দিন্দার হাতখানা চেপে বলল, 'হ্যাঁ।'

যেন করবীদিকে কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যাবে সেই ভয়ে দিন্দা করবীদির হাত শক্ত করে ধরে থাকলেন।

দিন্দা বেশ জখম হয়েছিলেন। কলকাতায় হাসপাতালে ছিলেন দিন কুড়ি। করবীদিও তখন কলকাতায় ছিল। আমি ফিরে এসেছিলাম 'আমার ইউনিটে। শুনলাম ওরা দু'জনেই ফিরে এসে করবীদিদের বাড়ীতে উঠবে। করবীদির বাবা নিজেই উদ্যোগ করে কলকাতায় গিয়ে ব্যবস্থাটা করে এসেছেন। দিন্দার কিছুদিন বিশ্রাম দরকার।

করবীদির চিঠি পেয়ে স্টেশনে গিয়েছিলাম। ট্রেন থেকে দু'জনে একসঙ্গে নামলেন। দিন্দার কপালে সদ্য শুকনো ত্যারচা একটা কাটা দাগ। আমার মনে হলো জয়টিকা।

ঘোড়ার গাড়ীতে ওদের সঙ্গে আসতে আসতে বাড়ীর কাছে এসে যখন নামতে গেলাম তখন করবীদি আমার কানে ফিসফিস করে বলল, 'ডিসেম্বরে অল ইণ্ডিয়া কনফারেন্স হবে লখ্নউতে, ওর ইচ্ছে বিয়েটা সেইখানেই হয়, শেষ অধিবেশনের পর।'

প্রথমটায় একটু অবাক লাগলেও সামলে নিলাম। শেষ পর্যন্ত করবীদি দিন্দাকেই বিয়ে করছে। আশ্চর্য বটে!

হেসে বললাম, 'এক কনফারেন্সের শেষে যার শুরু, আরেক কনফারেন্সের শেষ দিয়ে তা সারা করতে চাও।'

করবীদি খিলখিল করে হেসে উঠল।

দিন্দা পার্টি অফিসে এসে বসবার শক্তি পেলেই আমাকে শহর ছেড়ে বেরুতে হলো। পার্টির কাজ অসম্ভব বেড়ে গেছে। লোক দরকার প্রচুর। একটু পোক্ত হলেই তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে

অন্যত্র, নতুন কেন্দ্র গঠনের কাজে।

এখানে ওখানে ঘুরতে ঘুরতে বিহারে এসে নভেম্বর মাস নাগাদ ডেরা গাড়লাম। বছরখানেকের মতো এখানে স্থিতি।

কিন্তু ডিসেম্বরে নয়, লখ্‌নউ সম্মেলন হলো ফেব্রুয়ারীতে।

দিন্দাও এসেছেন, কিন্তু কোথায় করবীদি? আমি চুপ করে আছি। টাঙ্গা খপ খপ করে চলছে। মাঝে মাঝে ঝাঁকি লাগছে বেশ।

দিন্দা বললেন, 'বিয়েতে করবী আমাকে নেমন্তন্নর চিঠি পাঠিয়েছিল। সঙ্গে একটা চিরকুট।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি লিখেছিল!'

দিন্দা বললেন, 'হয়তো কোনো কৈফিয়ত হবে। পড়ে দেখিনি।'

চার

শরৎদা

প্রায় ছ'বছর বাদে, কলকাতার এক বাসে, গত বছর করবীদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তখন ইস্ট রেঞ্জে ওরা বাসা করেছে।

সে বাসায় একদিন গিয়েছিলাম। করবীদির ঘরকন্নাও দেখলাম। আর জিজ্ঞাসা করেছিলাম, দিন্দাকে কেন বিয়ে করলে না।

করবীদি বলেছিল, 'দিন্দা ভাই মানুষ নয়, রোবট। একটা রাজনৈতিক দলের প্রত্যঙ্গ। আমি মানুষ চেয়েছিলাম, যান্ত্রিক নয়, রক্ত-মাংসের। আমি জীবন চেয়েছিলাম। পার্টি নয়। তোরা হয়তো হাসবি। একদিনকার বিপ্লবী মেয়ের মুখে আজকের এই কথা শুনে বিদ্রূপ করবি। কিন্তু পার্টিতে আমি ছিলাম বঁড়শি-বেঁধা মাছ। পরিত্রাণের জন্য লেজের ঘাই মারতাম। তোরা ভাবতি আমার কি তেজ। রাজনীতি তো জীবন নয় ভাই, জীবনের একটা অংশ।'

করবীদি একটু মোটা হয়েছে। আগের চাইতে যেন রংটাও খুলেছে। সিঁথিতে সিঁদুরও উঠেছে। চুপ করে আছি দেখে খোঁচা মারলেন।

'কি, এখনো সেই পুরানো দলেই আছিস ?'

হেসে বললাম, 'হ্যাঁ।'

'দেশে যাস ?'

বললাম, 'না।'

'কতদিন ?'

জবাব দিলাম, 'বছর খানেক।'

'তাহলে তো তুই শরৎদার খবর জানিস না ?'

বললাম, 'না।'

করবীদি গম্ভীর হয়ে গেল।

বললে, 'ওঁর মেয়েটি মারা গেছে।'

করবীদি হাত ব্যাগ খুলে এক চিঠি বের করে দিল। পড়লুম। দিন্দা লিখেছেন।

'করবী, শুনে দুঃখিত হবে, শরৎদার মেয়েটি মারা গেছে। যদিও ওঁর সঙ্গে যাবতীয় যোগাযোগ হারিয়েছিলুম, কিন্তু এই ব্যাপারের পর দেখা করতে গিয়েছিলুম। গিয়ে আরো দুঃখ পেলাম। শরৎদা নিজের বাড়ীতে ফিরে গিয়েছিলেন মেয়েকে নিয়ে। সেখানেই মারা গেছে। মেয়েটি জন্ম থেকেই রুগ্ন ছিল। পাছে অহিত হয়, তাই শরৎদা বন্ধ ঘরে তাঁকে রেখেছিলেন। চার বছরের মেয়েটি আলো দেখেনি। হাওয়া লাগেনি তার গায়ে। এ অবস্থায় সুস্থ লোকই টিকতে পারে না, তো রুগ্ন শিশু। শরৎদাও সেই ঘরে বসে থাকেন। তেমনি অন্ধকারে। কখনো বের হন না। বললুম, তো অসহায়ের মতো বললেন, বাইরে যাবো ? কোথায় ? আমার মুখে জবাব জোগাল না। যদি কখনো আসো, একবার দেখা করো।'

করবীদি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'কাজ আছে নাকি ভাই হাতে ? যাবি আমার বাসায়, এই তো কাছেই—কণ্ডাক্টর রোক্কে।'

ইস্ট রেঞ্জের একটা দোতলা ফ্ল্যাটে থাকে করবীদি আর তার

স্বামী ভূপতি দত্ত। স্বামীটি এ জি বেঙ্গলে কাজ করেন, করবীদি টেলিফোনে। অথচ করবীদি বড় গোঁসাই বাড়ীর মেয়ে। ঠাকুর-বাড়ীর কল্যাণে বেশ দু'পয়সা আছে। করবীদি বিয়ে করেছে বাড়ীর অমতে। তাই পরিবার থেকে ত্যাজ্য হয়েছে। বেশ সাজানো গোছানো ফ্ল্যাট। কোথাও একটু ময়লা পড়ে নেই। মনে হলো করবীদি সুখেই আছে।

বললে, 'ভাই, আজ আর আমার কোনো পলিটিকস্ নেই। আমার চোখে তোরা সবাই সমান। দিন্দাও আসে মাঝে মাঝে। ঘোর পলিটিকস্ করছে। মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হয়েছে। বস ভাই, কিছু খাবার করে আনি।'

করবীদি ভেতরে চলে গেল। আমার শুধু শরৎদার কথা মনে পড়ছিল। শরৎদার ছাত্রী ছিল করবীদি। ওকে পলিটিকসে নামিয়েছিলেন শরৎদা। একদিন করবীদি পলিটিকস্ ছাড়া আর কিছুই বুঝত না। আজ বলে গেল, আমার কোনো পলিটিকস্ নেই। আহা, এটা যদি করবীদি কয়েক বছর আগেও বুঝত! তবে বোধ হয় শরৎদার জীবনে এত বড় ট্রাজেডি ঘটত না। একটা অফুরন্ত সম্ভাবনাময় জীবনীশক্তি এমনি করে নিজেকে কামড়ে কামড়ে মেরে ফেলত না। শরৎদা আমারও মন্ত্রদাতা। জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য পলিটিকস্ না করে, আমরা অন্য বৃত্তে ঘুরেছিলুম, পলিটিকস্‌কেই জীবনের সব করে তুলেছিলুম। হয়তো সেই ভুলেই এত বড় প্রতিভার এমন শোচনীয় আত্মাহুতি হলো।

শরৎদাকে তিন অবস্থায় আমি দেখেছি। এক, যখন ইস্কুলে আমাদের পড়াতেন; দুই, যখন ওঁর সঙ্গে পার্টি করেছি; আর তিন, তাঁর শেষের দিকের অবস্থায়।

শরৎদা আমাদের ইস্কুলে খুব নামকরা মাস্টার ছিলেন। ছেলেরা তাঁকে খুবই ভালবাসত। আমরা ওঁর কাছে নিচের দিকের ক্লাসে, মাত্র ক'মাস পড়েছিলুম। আমাদের ক্লাস থেকেই ওঁকে ধরে নিয়ে

যায়। তারপর বছর চার-পাঁচ বাদে যখন তাঁকে দেখি তখন আমার ইস্কুল ছাড়বার সময় প্রায় হয়ে এসেছে।

পুলিশ যেদিন তাঁকে গ্রেপ্তার করে, আমাদেরই চোখের সামনে, সেদিনটা মনে আছে। আমাদের তখন মর্নিং ইস্কুল চলছে, সেই দিনই ইস্কুল বন্ধ হবে। বোধ হয় থার্ড পিরিয়ডে, ঠিক মনে পড়ছে না, শরৎদা ক্লাসে ঢুকলেন। আমরা উসখুস করছি, কথাটা বলি বলি করে। ইস্কুল বন্ধের আগের দিনটা পড়াশুনা হয় না। আমরা মাস্টারদের খাওয়াই। শরৎদা কিছুতেই খেতে চাইতেন না। বলতেন—এসব ঘটা এদেশের লোক হয়ে করা শোভা পায় না। যে দেশে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক নিরন্ন, সে দেশে এই ধরনের অপব্যয় মহাপাপ। তোমরা ছাত্ররা, দেশের ভবিষ্যৎ। দায়িত্বহীনতা তোমাদের সাজে না। আরো অনেক শক্ত শক্ত কথা বলতেন, আমরা যার মানে বুঝতুম না। কতক কানে ঢুকত, কতক নয়। এবার আমরা ঠিক করেছিলুম, ওঁকে কিছু খাওয়াবোই।

সতীশকে দিয়ে বলাতেই, এবারে রাজী হয়ে গেলেন। সতীশ ওঁর খুবই প্রিয় ছিল।

শুধু বললেন, 'খাওয়াবে? দাও। আবার দেখা হয় কি না হয়, ঠিক কি! একটা আক্ষেপ থেকে যাবে।'

ওঁর সম্পর্কে এইটুকু শুধু মনে আছে। হ্যাঁ, আরো একটা ব্যাপার সেদিন ঘটেছিল। হঠাৎ দলে দলে পুলিশ এসে ইস্কুল বাড়ীটা ঘিরে ফেলেছিল। হেডমাস্টার ছিলেন রায়সাহেব। তাঁর সে কি বিপর্যস্ত অবস্থা সেদিন। হন্তদন্ত হয়ে ছুটোছুটি করছিলেন। আর বারে বারে পুলিশ সুপারের কাছে গিয়ে হাত কচলাচ্ছিলেন।

'স্যর বলুন, কি করতে পারি।'

কিন্তু হেডমাস্টার মশায়ের অনুনয়-বিনয়ে কোনোই ফল ফলেনি। পুলিশ শরৎদাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিল। শরৎদা সে সময়ে খাচ্ছিলেন। সতীশ ক্লাসের বাইরে কি করতে যেন গিয়েছিল।

হুড়মুড় করে ঢুকে বললে, 'ওরে বাপরে, কত পুলিশ!'

মনে আছে, শরৎদা খেতে খেতে একবার মুখ তুলেছিলেন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত পুলিশ, সতীশ?'

সতীশ জবাব দিয়েছিল, 'অনেক স্যর, অনেক।'

'অ' বলে শরৎদা খাওয়া শেষ করলেন। জল খেলেন ধীরে-সুস্থে।

ক্লাসে ক্লাসে তখন উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছি আমরা। কেউ কেউ কাঁদতে শুরু করেছে।

শরৎদা বললেন, 'ছি, কে কাঁদে? কেঁদো না। আজ তোমরা ছোট আছ, কাল বড় হবে। তোমাদের উপর দায়িত্ব পড়বে দেশকে স্বাধীন করবার। কত লড়াই করতে হবে তার ঠিক কি। ভয় পেলে লড়াই করবে কি করে?'

লেকচারে কি ভয় কাটে? ধপাস ধপাস শব্দ করতে করতে কতকগুলো বুটের শব্দ আমাদের ক্লাসের দিকেই এগিয়ে আসছিল। হেডমাস্টার মশাইকে দরজার কাছে দেখলুম। পেছনে বেল্ট-আঁটা বুট-পরা, খাকীর প্যাণ্ট-শার্ট পরনে আর সোলার হ্যাট মাথায় এক সাহেব। তারপরেই সাত-আটজন পুলিশের লোক।

হেডমাস্টার মশাই ঢুকলেন। ভয়ে, বিরক্তিতে, রাগে সে এক অদ্ভুত অবস্থা হয়েছে তাঁর।

বললেন, 'শরৎবাবু, আপনাকে ডিসমিস করলাম। পলিটিক্যাল ক্রিমিন্যালদের স্থান আমার ইস্কুলে নেই। ওঃ ডেঞ্জারাস্।'

তারপর বাইরের সাহেবটির দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনি আসুন, গ্রেপ্তার করুন।'

সাহেবটি আমাদের ক্লাসে ঢুকবে শুনেই আমাদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম করল।

সাহেব ক্লাসে ঢোকবার উদ্যোগ করতেই শরৎদা বললেন, 'বাইরে থাকুন, ক্লাসের পবিত্রতা নষ্ট করতে চাইনে।'

একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ধীর পায়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। ভারী ভারী বুটগুলো নিচে নেমে গেল। ইস্কুলময় উত্তেজনা। ক্লাস ভেঙে ছেলেরা বাইরে বেরিয়ে গেল। দেখলুম, শরৎদাকে হাতকড়ি পরিয়ে গাড়িতে তুলছে।

হঠাৎ দিন্দাকে দেখলুম, ফার্স্ট ক্লাসের লম্বা-চওড়া জোয়ান মর্দ ছেলে, দিন্দা ইস্কুলের পাঁচিলের উপর উঠে দাঁড়িয়ে 'শরৎদা কি জয়' বলে চেঁচিয়ে উঠল। কেউ সাড়া দিলে না।

হেডমাস্টার মশাই চমকে, হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন, ধমক লাগালেন, 'এই উল্লুক, নেমে আয়।'

দিন্দার ভয় নেই, ভ্রূক্ষেপ নেই। আবার আওয়াজ তুলল, "বন্দেমাতরম্।" সে ধ্বনি আমাদের পরিচিত। নিষিদ্ধ ধ্বনিটাতে এবার আমাদের বুকে ঢেউ উঠল, মুখে প্রতিধ্বনি ফুটল—"বন্দে মাতরম্।"

কয়েকশত কণ্ঠ একই সঙ্গে সাড়া জাগালে। পাড়া জাগালে। পুলিশের ভয়, হেডমাস্টারের ভ্রূকুটি কোথায় ভেসে গেল। সেদিন দিন্দার নেতৃত্বে ইস্কুলসুদ্ধ ছেলেরা সারা শহর ঘুরেছিলুম।

শরৎদা সম্পর্কে অনেক কথা দিন্দার মুখ থেকে শুনেছি।

দিন্দা বলতেন, 'জানিস, এমন লোক হয় না। শরৎদার বাড়ী তো দেখিসনি, সে এক বিরাট পুরী। চার-পাঁচ পুরুষের ডাকসাইটে জমিদার বংশ। এখন অবিশ্যি প্রায় কিছুই নেই। তাও, নেই নেই করে'ও যা আছে না, দেখলে অনেকেই ভিরমি খেয়ে পড়বে। কিন্তু শরৎদা জ্ঞানবুদ্ধি হওয়া ইস্তক সেসব পয়সা হাতে ছোঁননি। বি-এ, এম-এ পাশ করেছেন টিউশনি করে। বলতেন—ওসব পয়সা অন্যায়ের কড়ি, কতলোককে শোষণ করে ও টাকা আমাদের গুষ্ঠি জমিয়েছে, আমাকে তো তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এই জন্যে শরৎদার বাবাও ওঁকে দেখতে পারতেন না। বাড়ী থেকে তাড়িয়ে

তারপর শরৎদা প্লাটফরমের উপর উঠে গোটা ক্লাসের উপর

দিয়েছিলেন। কি মহৎ প্রাণ, বল দিকিনি।'

শুনেছিলুম, রাজদ্রোহিতার চার্জে তাঁর পাঁচ বছর জেল হয়েছে। হেডমাস্টার মশাই শরৎদাকে বড্ড ঘৃণা করতেন। ওঁকে মাস্টারী দেওয়ায় তাঁর ইস্কুলের গ্রাণ্ট কাটার উপক্রম হয়েছিল। রায়বাহাদুর হবার সম্ভাবনাও দূরে সরে গেল। পাঁচ বছর জেল হয়েছে শুনে তিনি নাকি দুঃখিত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, মহামান্য সম্রাট দয়া দেখান বলেই এই ধরনের ক্রিমিন্যালরা বড্ড প্রশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে। যেখানে লোকটার ফাঁসী হওয়া উচিত, সেখানে তার সাজা হলো কি না মাত্র পাঁচ বছর জেল।

তবে শরৎদা পাঁচ বছরের আগেই খালাস পেয়েছিলেন। আমি তখন ম্যাট্রিক দিয়ে প্রেমসে পলিটিকস্ করছি। আমাদের এলোমেলো কাজে শরৎদা শৃঙ্খলা আনলেন। আর আনলেন এই করবীদিকে। করবীদি নিজেই এসেছিল। জেলে যাবার আগে শরৎদা করবীদিকে পড়াতেন। ওদের বাড়ীতে গোঁড়ামি খুব। করবীদিই বোধ হয় বাড়ীর প্রথম মেয়ে, যে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। কলেজে পড়ারও ইচ্ছে ছিল, বাড়ীর অনুমতি না পাওয়ায় সেটা আর হয়ে ওঠেনি। শরৎদা ফেরার পর বোধ হয় করবীদির সে ইচ্ছেটা আবার জেগে উঠেছিল। বাড়ীতে বললে, প্রাইভেটে আই-এ দেবে। শরৎদা যদি এখন পড়ান। শরৎদারও একটা সংস্থান হয়ে গেল। শরৎদাকে ওরা বাড়ীতে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু শরৎদা বাপ-ঠাকুরদার অর্থটাই ছাড়তে পেরেছিলেন, আভিজাত্যটুকু নয়। তাই করবীদিদের বাড়ীতে থাকতে রাজী হননি।

করবীদি আই-এর পড়া কতটুকু পড়ল কে জানে, তবে পলিটিক্সে দড় হয়ে উঠল। আর শেষ পর্যন্ত রেষারেষি যেটা শুরু হয়েছিল শরৎদা আর দিন্দার মধ্যে, তাও-ও বোধ হয় করবীদিকে নিয়েই। সেটা অবিশ্যি আমার অনেক পরে মনে হয়েছে।

সূত্রপাতটা হয়েছিল থিওরী নিয়ে। দিন্দা ফিল্ড ওয়ার্কার।

খুবই কাজের লোক। পার্টিকে দেখতে দেখতে কেমন সুন্দরভাবে গড়ে তুললেন। যে কোনো কাজের সমর্থনে মার্কস এঙ্গেলস্ লেনিন থেকে উদ্ধৃতি ঝড়াঝ্ঝড় তুলে দিতেন। শরৎদা অতি ধীর স্বভাবের লোক। চিন্তাশীল। জেলে বসে বিস্তর পড়াশুনা করেছেন। বহুক্ষেত্রে দিন্দার কাজ সমর্থন করতে পারতেন না। এই নিয়ে দু'জনের মধ্যে ঘোরতর তর্ক চলত।

শরৎদা বলতেন, 'দিনু একখানা বই না পড়েও কেমন করে মার্ক্সিস্ট হলো, বুঝিনে। ও যা বলে, তার সঙ্গে মার্কসবাদের সম্পর্ক কোথায় খুঁজে পাইনে, সস্তা কতকগুলো প্রচারপত্র পড়েই ভেবেছে বুঝি মার্ক্সিস্ট হলাম।'

দিন্দা বলতেন, 'গুচ্ছের বই পড়লেই মার্ক্সিস্ট হওয়া যায় না। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদ আপনিই উপলব্ধি করা যায়।'

আসলে দিন্দা শরৎদা থেকে ঢের বেশী পলিটিসিয়ান, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ধীরে ধীরে পার্টিকে নিজের হাতের মুঠোয় করে ফেললেন। শরৎদার প্রভাব যে পার্টি থেকে প্রায় মুছে যাবার মতো হয়েছে, তা শেষ দিন পর্যন্তও তিনি বুঝতে পারেননি। রাতদিন পড়াশুনা নিয়ে থাকলে চোখ খোলা রাখবেন কি করে?

দিন্দার একমাত্র ভাবনা এখন করবীদিকে নিয়ে। করবীদি বিপক্ষে থাকলে মুস্কিলের সম্ভাবনা থেকে যায়। শরৎদাকে আমি শ্রদ্ধা করতুম। রাজনীতিতে যে স্বল্প পরিমাণ জ্ঞানও আমি পেয়েছি, সে সবই শরৎদার কাছ থেকে।

করবীদির সঙ্গে আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাই আমার সঙ্গে ওঁর ভাবও ছিল একটু বেশী। আমি জানতুম করবীদি যত আগ্রহে পলিটিক্স্ করছে, তার সবটাই পলিটিক্সের জন্য নয়। ও শরৎদাকে ভালবাসত। কিন্তু শরৎদা বোধ হয় সেটাকে আমল দেননি। তাঁর চোখে তখন শুধু পলিটিক্স্ আর পলিটিক্স্।

আমার মনে হয়, করবীদি বোধ হয় খানিকদূর এগিয়েও

গিয়েছিল। কি করে সে কথা মনে হলো বলছি। একদিন শরৎদার বাসায় গিয়েছি। কিছুদিন আগেই শরৎদা অসুখ থেকে ভুগে উঠেছেন। ঘরে ঢুকতে যাব, দেখি শরৎদা করবীদিকে বকছেন আর করবীদি কাঁদছে।

শরৎদা বলছেন, 'এই মতলবে তুমি পার্টি করতে এসেছিলে? ছিঃ, ঘেন্না ধরিয়ে দিলে। ছাখ করবী, রাজনীতি করবে তো তাই কর, বিয়ে করে সংসার পাতবে তো তাই পাতো, কিন্তু ছুটো এক সঙ্গে করতে যেও না। ছুটো মনিবকে এক সঙ্গে সেবা করা যায় না।'

আমি ঘরে ঢুকতেই সে প্রসঙ্গ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ছু'জনের মধ্যে অস্বস্তির ভাবও দেখেছিলুম। দিন্দাকে রিপোর্ট দিয়েছিলুম বিস্তারিত। আর তাতেই কাজ হয়েছিল। বাকীটা দিন্দাই করেছিলেন।

সত্যি, ছয় মাসের মধ্যে করবীদির এতটা পরিবর্তন হবে, ভাবতে পারিনি। করবীদি যে এতটা পারবে তাও আমার কল্পনার অতীত ছিল।

সেবার ওদিকে ভীষণ বন্যা হয়েছিল। সমস্ত পার্টি মিলে এক সংযুক্ত বন্যাত্রাণ তহবিল খোলা হয়েছিল, শরৎদা ছিলেন তার সেক্রেটারী। সেই তহবিল থেকে রহস্যজনকভাবে দেড় হাজার টাকা উধাও হয়ে গেল। শরৎদা পাগলের মতো হয়ে গেলেন, হদিস বের করতে পারলেন না। শুধু শরৎদা কেন, তাঁর সঙ্গে আমাদের পার্টির ঘাড়েও বদনাম পড়তে লাগল। দিন্দা আর করবীদি পার্টির সুনাম বজায় রাখতে যে কাণ্ড করলেন, তা আমি কখনো পারতুম না। সেইদিনই বুঝতে পেরেছিলুম, পলিটিক্স্ করার মতো স্নায়ুর জোর দিন্দার আছে, আমার নেই।

স্পষ্ট মনে পড়ে কুণ্ডুদের বাড়ীর দরদালানটা। হ্যাজাগ লণ্ঠনের আলোয় অন্ধকার সরে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

যেন মওকা পেলেই লাফিয়ে আসবে। সারা ঘর ভর্তি লোক।

তহবিল তছরুপের সভা!

শরৎদার চোখেমুখে কেমন যেন অসহায়ের ছাপ। চশমাটা ঝুলে ঝুলে নাকের ডগায় নেমে আসছে। ওই কালো আঁচিলটায় বাধা না পেলে হয়তো পড়েই যেত। আর কি প্রচণ্ডভাবে ঘামছেন। একজনের পর আর একজন উঠে বক্তৃতা দিচ্ছে, গালাগাল দিচ্ছে শরৎদাকে। চোর বললে। আমাদের পার্টিও বাদ যাচ্ছে না। আমাদের রক্ত গরম হয়ে উঠছে। শরৎদার জন্য আমরাও গাল খাচ্ছি, তাঁর উপরেও রাগ হচ্ছে জোর। শরৎদাকে কেউ কিছু বলতেই দিচ্ছে না। বলতে চেষ্টা করলেই "চোর চোর" বলে তাঁকে বসিয়ে দিচ্ছে।

হঠাৎ করবীদি উঠে দাঁড়াল। হৈ-চৈ একটু কমে গেল।

বললে, 'শরৎবাবু যদি টাকা চুরি করে থাকেন'—তার কথা বেরুতে না বেরুতেই শরৎদা যেন বৈদ্যুতিক শক খেয়ে লাফিয়ে উঠলেন।

'কি, কি বললে, আমি টাকা চুরি করেছি। আমি—'

"চোর চোর", "বসো বসো" বলে সভাসুদ্ধ লোক তাঁকে বসিয়ে দিলে।

শরৎদা ধপ করে সেই যে বসে পড়লেন, আর ওঠেননি। চেয়ে দেখলুম তাঁর মুখ থেকে কে যেন সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে।

করবীদি অকম্পিত কণ্ঠে বলে গেলেন, 'শরৎবাবু যদি টাকা চুরি করে থাকেন তো তার যাবতীয় ঝক্কি তিনিই সামলাবেন, আমাদের পার্টিকে এর মধ্যে জড়াচ্ছেন কেন? আমরা পার্টি মিটিং-এ শরৎবাবুকে হিসাব দাখিল করতে বলেছিলাম, কিন্তু দুঃখের কথা, তিনি সন্তোষজনক হিসাব দেখাতে পারেননি। সে কারণে পার্টির স্পেশাল মিটিং-এ ওঁর সভ্যপদ বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।'

করবীদি আর কিছু না বলে বসে পড়ল। করবীদির বক্তৃতা এতই

আকস্মিক যে, আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। কিছুতেই মনে করতে পারছিলুম না, কোন্ মিটিং-এ আমরা শরৎদাকে পার্টি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

পিছন থেকে দিন্দার ফিসফিস আওয়াজ শুনলুম, 'বেশ বলেছ।'

দেখলুম করবীদি আর দিন্দা বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছে।

করবীদি এতক্ষণ পরে যেন একটু নার্ভাস হয়ে পড়ল। তবু মুখে জোর দেখিয়ে বলল, 'পার্টির থেকে শরৎদা বড় নন।'

দিন্দা তার পিঠ চাপড়ে দিলেন, 'সাবাস।'

কিন্তু আমি! আমি কি সত্যিই বিশ্বাস করেছিলুম, শরৎদা চোর! উত্তরকালে ঘটনাটা কতবার মনে হয়েছে। কতবার মনকে জিজ্ঞাসা করেছি, শরৎদা কি চোর? স্পষ্ট করে মনের কাছ থেকে হাঁ জবাব পাইনি। তবে টাকাটা কি হলো? শরৎদা কেন হিসেব দিতে পারলেন না? এটা এক রহস্য থেকে গেল আমার কাছে।

সেদিন সেই সভায় শরৎদার প্রতি অমানুষিক ব্যবহার করা হয়েছিল। তাও কখনো ভুলব না। কেউ বললে, পুলিশে দাও, কেউ বললে, মারো। চোরের শাস্তি হওয়া দরকার। শরৎদা হাঁ না কিছুই করলেন না। উত্তেজনা যখন চরমে উঠেছে, তখন সিদ্ধান্ত হলো, ওঁর মাথা ভুরু কামিয়ে জুতোর মালা পরিয়ে শহরে ঘুরাও। একজন নাপিত ডাকতে গেল। এই সময় পিঠে ধাক্কা খেয়ে পেছনে ফিরলুম। দেখি আমাদের পার্টির সব উঠে যাচ্ছে।

করবীদি বলছে, 'উঠে এসো।'

সত্যি বলছি, উঠে যাবার অনেক চেষ্টা করলুম, পারলুম না। ওই যে রক্তহীন ফ্যাকাশে মর্মরমূর্তির মতো শরৎদা বসে আছেন তাঁর আকর্ষণ আমাকে জোর করে বসিয়ে রাখলে।

নাপিত এল। শরৎদার মাথা কামিয়ে ফেললে! তিনি একটুও বাধা দিলেন না। আমার কেমন ভুল হয়ে যায়। তারপরের ঘটনা আর কিছুতেই মনে করতে পারিনে। ভুরু কি কামিয়েছিল? আমার

একবার মনে হয়, আমি বাধা দিয়েছিলুম, ভুরু কামাতে দিইনি। কিন্তু আমার মতো ভীতু লোকের পক্ষে অতটা সাহস দেখানো সম্ভব কি ?

তারপর তাঁকে শহর ঘোরানো হলো। পোড়ামাতলা, যুগনাথ তলা, বুড়ো-শিবতলা, বাজার, চারচারা পাড়া ঘুরে ঘুরে প্রোসেশন চলল। "চোর চোর" চীৎকার। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শরৎদা জুতোর মালা গলায় পরে চলেছেন। প্রায় চল্লিশ জনের একটা দল তাঁকে ঘিরে চলেছে। আমাদের ইস্কুলের কাছে এসে প্রোসেশনটা দাঁড়াল। 'চোর চোর" চীৎকার উঠতেই ক্লাসসুদ্ধ ছেলে ভেঙ্গে পড়ল মজা দেখতে! তারাও চেঁচিয়ে উঠলে "চোর চোর।" মনে পড়ল আরেক-দিন সকাল বেলার কথা। শরৎদাকে পুলিশে গ্রেপ্তার করেছিল, এই ইস্কুল থেকে। ওই তো সেই পাঁচিল, দিন্দা উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার দিয়েছিল, "শরৎদা কি জয়।"

বকুলতলা থেকে কে একজন বললে, 'যথেষ্ট হয়েছে, আর না। এবার ওকে ছেড়ে দাও, বাড়ী যাক।'

কে আরেকজন বললে, 'কেউ একজন সঙ্গে যাক।'

কে যাবে, কে যাবে ? একজন আমাকে দেখিয়ে দিলে, 'ও তো ওরই দলে। ও-ই যাক না।'

আমার উপর ভার দিয়ে সবাই সরে পড়লেন। গনগনে রোদ্দুর। লোকজন সব চলে গেছে। শুধু আমি আর শরৎদা। চুপচাপ পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখ ফ্যাকাশে। চোখ বোঁজা। আমি গলা থেকে জুতোর মালাটা খুলে দিলুম। চশমাটা ঝুলে প্রায় পড়ে যাবার মতো হয়েছিল, ঠিক করে দিলুম। শরৎদার নড়ন-চড়ন নেই। পথের পাশে বারান্দায় বসিয়ে দিলুম। বসে পড়লেন।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'কোথায় যাবেন, শরৎদা !'

চোখ খুলে আমার দিকে চাইলেন।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'কোথায় যাবেন ?'

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

বললুম, 'বাসায় যাবেন ?'

ক্লান্তভাবে মাথা নেড়ে জানালেন, 'না।'

আবার জিজ্ঞাসা করলুম, 'তবে ? বাবার কাছে যাবেন ?'

ঘাড় নাড়লেন—হ্যাঁ।

দিন্দা ভুল লিখেছেন। মেয়ে নিয়ে নয়, বিয়ে হবার আগেই শরৎদা নিজের বাড়ীতে গিয়ে উঠেছিলেন। আমিই পৌঁছে দিয়ে এসেছিলুম। পার্টির আর কেউ শরৎদার খোঁজ তো করত না। জানবে কি করে ?

সেদিন করবীদি যখন বললে, আজ আমার কোনো পলিটিকস্ নেই, তখন ইচ্ছে হয়েছিল একবার, জিজ্ঞাসা করি শরৎদা টাকা চুরি করেছে, এটা ও বিশ্বাস করে কি না। কিন্তু পুরানো কথা তুলে লাভ কি ? রহস্যটা আমার কাছে রহস্যই থাক। আরো একটা রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারিনি। পরের কয়েক বছর পার্টির কাজ অত ভালভাবে চলেছিল কি করে ? আমরা অনেক পুস্তিকা ছাপিয়েছিলুম, তিনজন হোলটাইম ওয়ার্কার রেখেছিলুম, তিনটে মহকুমায় বছর দুই ধরে অফিস রেখেছিলুম। কোথা থেকে এই খরচ মেটাতুম, তাও বলতে পারিনে। করবীদি হয়তো পারতে পারে, কিন্তু সে কথাও আর জিজ্ঞাসা করলুম না। প্রয়োজন কি ?

করবীদি সামনে বসে আমাকে খাওয়ালে। শরৎদার কথা জিজ্ঞাসা করলে। ওর কথাবার্তায় কোথাও তো আন্তরিকতার অভাব দেখলুম না। অথচ এই করবীদিই না একদিন শরৎদাকে প্রকাশ্যে চোর বলতেও বাদ রাখেনি। শরৎদাকে যখন পার্টি থেকে খেদিয়ে দেওয়া হলো, সেইদিনও এই করবীদিই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পরে অবশ্য জেনেছিলুম, করবীদি পুতুল মাত্র, অদৃশ্য থেকে যেমন ইঙ্গিত পাচ্ছিল, অভিনয়টা তার সেই মতোই চলছিল। এই মেয়ে আর সে মেয়ে, ব্যক্তি তো একই। কিন্তু তবু কেমন দুটো আলাদা

ব্যক্তিহ হয়ে গিয়েছিল। কেন, পার্টি পলিটিক্‌সের মধ্যে কি এমন রহস্য আছে, যা মানুষকে মানুষ রাখে না, আজ্ঞাবহ পুতুল করে তোলে? এ প্রশ্নের হদিস আজও আমার মেলেনি।

আজ শরৎদার দুর্ভাগ্যে করবীদি আমার সামনে দীর্ঘশ্বাস ফেললে, এর মধ্যে একটুও ফাঁকি নেই। আমি চলে গেলে হয়তো চোখের জল ফেলবে। কিন্তু এই করবীদিই আর এক দিন, পার্টি মিটিং-এ শরৎদার সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক তুলে দেবার প্রস্তাব অকম্পিত কণ্ঠে সমর্থন করেছিল, আমি সে প্রস্তাবে সায় দিতে পারিনি বলে আমাকে কী তীব্রভাবে বিদ্রূপ করেছিল। শুধু কি তাই, সে প্রস্তাবের একটা কপিও শরৎদার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। রাজনীতি কি মানুষকে এত নিষ্ঠুর করে?

শরৎদা বাড়ী ছেড়ে বেরুতেন না। করবীদি তার কারণ খুঁজে পায়নি। বলত, মুখ দেখাবার জো নেই, তাই। হয়তো তাই। আমার সঙ্গে যে কয়েকবার শরৎদার দেখা হয়েছে, হয়েছেও বার দুই-তিন, শরৎদাকে শুধু বাড়ীর মধ্যে নয়, একেবারে ঘরের মধ্যে বসে থাকতে দেখেছি। বন্ধ ঘরে বসে থাকতেন। দরজা-জানালা তো বন্ধই থাকত, ফাঁক-ফোকরগুলোও কালো পর্দা দিয়ে বন্ধ করে রেখেছিলেন। সে ঘর ছেড়ে বেরুতে চাইতেন না। বলতেন, বাইরেটা বড় নোংরা, ওখানে বড় নোংরামী। শুনেছি বিয়ে করতে গিয়েছিলেন ঢাকা গাড়ী করে। দুর্ভাগ্যত বৌ বেশীদিন বাঁচেনি। একটি মেয়ে প্রসব করে হাসপাতালেই মারা যায়।

শরৎদার বৌকে আমি কখনো দেখিনি, মেয়েকে দেখেছি। বছর চারেক বেঁচেছিল। আমি যখন দেখি, তখন মেয়েটিও ভুগছে, বছর আড়াই বয়স হবে। আমাদের এক ডাক্তারবন্ধু চিকিৎসা করত। বলত, মেয়েটা বাঁচবে না, আলো নেই, হাওয়া নেই, এর মধ্যে যে এতদিন বেঁচে আছে সেই যথেষ্ট।

বলতুম, 'তুই বলতে পারিসনে সে কথা?'

ডাক্তারবন্ধু বলত, 'কাকে বলব? শরৎদাকে বললেই শরৎদা শিউরে ওঠেন। বলেন—না না, দরজা-জানালা বন্ধ থাকবে। আমি দেখেছি বাইরের হাওয়ায় বড় নোংরামী। আমি চাইনে আমার মেয়ের গায়ে সে হাওয়া লাগুক।—নিজেই মেরে ফেলবেন মেয়েটাকে।'

আর ফেললেনও।

আমি নিজেও একবার বলেছিলুম শরৎদাকে, কিন্তু শরৎদার এক কথা। নোংরা, নোংরা, বাইরে বড় নোংরামী। প্রথম যখন ওঁর ঘরে ঢুকতে যাই, বলেছিলেন—ওই দরজার কোণে লাইজল আছে, হাত ধুয়ে ঢোকো'। তোমরা তো রাজনীতি কর, তোমাদের হাত বড় নোংরা থাকে।

কমরেড নির্মলা সেন

নিরুদির সঙ্গে আমার পরিচয়ও এই রাজনীতির সূত্রেই। সে পরিচয় খুবই ঘনিষ্ঠতায় দাঁড়িয়েছিল।

নিরুদির দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, তাঁর স্নেহ-মমতার অনাবিল প্রকাশ, তাঁর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছিল আমাকে। এমন অতিথিবৎসল আমি কম দেখেছি। কি করে তাঁদের চলত জানিনে, কিন্তু সব সময়েই তাঁদের বাড়ীতে লোকের ভিড় লেগেই থাকত। আমিও বহুবার নিরুদির ওখানে খেয়েছি, থেকেছি, তাও আবার অতি দুঃসময়ে।

একদিনের কথা মনে আছে। আমাদের পার্টির সদর দপ্তরের একটা কামরায় শুয়ে জ্বরে ধুঁকছি, খাওয়া জোটেনি, এমন অনেকদিনই জুটত না, হঠাৎ নিরুদি এসে হাজির। তন্দ্রা এসেছিল, কপালে একখানা শীতল হাতের স্পর্শ পেতেই চোখ মেললাম। বড় ভাল লাগল নিরুদিকে। মৃদু হাসলাম। নিরুদিও হাসলেন।

'কি রে, কবে এসেছিস, ক'দিন পড়ে আছিস এখানে ?'

'হবে দিন চারেক।'

'চারদিন! এই জ্বর গায়ে! কেন, আমার ওখানে যেতে কি হয়েছিল?'

'না না, মিথ্যে আবার কাউকে কষ্ট দেওয়া কেন?'

'হুঁ। ভদ্রতা শিখেছিস। লোফারী ছাড়লে বিপ্লব কি এগুবে? নে ওঠ। নিজে নিজে পারবি, না ধরব?'

উঠতেই হলো। যেতেও হলো। নিরুদি এই ধরনের মানুষ।

নির্মলা সেনকে নিরুদির বাড়ীতেই দেখি! ওইখানেই থাকত। বছর সতের মেয়েটির বয়েস, রূপ ছিল না মোটেই। বেঁটে, আঁটসাঁট গড়ন, নিতান্ত গ্রাম্য চেহারা। সমগ্র মুখটিতে একটা মোটাবুদ্ধির ছাপ। প্রথম দর্শনেই বীতরাগ জন্মায়। প্রায় কথা-বার্তাই বলত না। তবু ওর নিঃশব্দ উপস্থিতি আমাকে পীড়িত করত।

আমরা যখন গভীর রাত পর্যন্ত রাজনৈতিক আলোচনায় মগ্ন থাকতাম, পার্টির আসন্ন বাৎসরিক সম্মেলনে পেশ করবার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাবের খসড়া করতাম, নিজের মতটাকে অভ্রান্ত প্রমাণ করবার জন্য উত্তেজিতভাবে তর্ক করতাম, ঝগড়া করতাম, নির্মলা তখন তার বোকা অস্তিত্বটাকে নিয়ে নিরুদির আড়ালে চুপ করে বসে থাকত। কেউ জল চাইলে এনে দিত, মাঝে মাঝে চা বানিয়ে এনে ঝিমিয়ে-পড়া উৎসাহকে চাঙ্গা করে তুলত।

নিরুদি ওকে খুব স্নেহ করতেন, নির্মলাও খুব ভালবাসত তাঁকে। এই নিয়ে আমরা অনেক ঠাট্টা-তামাসা করতাম। নির্মলা সেগুলো বুঝত কিনা সন্দেহ। নিরুদি হেসে তার জবাব দিতেন।

'আসল কথা, তোরা ওকে হিংসে করিস। তা বাপু ওকে না হয় একটু বেশী ভালবাসি, কি হয়েছে তাতে। বিপ্লবীর দলে টিপ-ছাপ দিয়েছি বলে কি স্নেহ-মমতা সব রবার দিয়ে ঘষে তুলে দিয়েছি? তা তোরাই বা সব কেমন বিপ্লবী, অ্যাঁ? জলজ্যান্ত একটা মেয়েকে কাজে নামাতে পারিসনে!'

নির্মলা কি কাজে অন্য ঘরে গিয়েছিল। সুযোগটা বৃথা যেতে দিলাম না।

'ওই গবাকান্ত মেয়েকে দিয়ে রাজনীতি করাতে চান? বলিহারী পছন্দ আপনার। ও মেয়ে সমাজে আগুন ধরাবে কি, উনুনে ফুঁ দিতেই তো ওর জন্ম।'

নির্মলা ঢুকতেই চুপ করে গেলাম। নিরুদি হাসতে লাগলেন।

'বাচ্চা বিপ্লবী কি না, তেজ একটু বেশী তোর, গোখরোর ড্যাসে ছোবল বেশী দেয়। কি রে নিমু, ভিড়বি নাকি এদের দলে? তোর ভবিষ্যৎ ভেবে তো ছোঁড়াদের আহার-নিদ্রা বন্ধ হবার জো হয়েছে।'

নিরুদির কথাটা শুনে নির্মলা ঠোঁটের এমন একটা কদর্য ভঙ্গী করল যে, আমার পিত্তি অবধি জ্বলে গেল।

'আমার বয়ে গেছে ধিঙ্গিপনা করতে।'

নিরুদি হেসে ফেললেন।

'তা তুই কি করতে চাস?'

নির্মলা নিরুদির মুখের উপর বোকা চোখ দুটো তুলে বললে, 'কেন, সব মেয়ে যা করে, আমিও তাই করব। বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার করব। রাস্তা দিয়ে ঝাণ্ডা নিয়ে ধেই ধেই করে নেচে বেড়ানো আমার দ্বারা হবে না। দেখলেই গা জ্বালা করে আমার।'

ছি ছি, এই প্রতিক্রিয়াশীল মেয়েটার উপর নিরুদির এত টান! নিরুদি যেন খুব মজা পেয়েছেন। আরো জোরে হেসে উঠলেন।

'ও মা, মেয়ের পেটে এত! তা হ্যাঁরে, আমিও যে হৈ হৈ করে ঘুরে বেড়াই। তাহলে আমাকে দেখেও তো গা জ্বালা করে তোর?'

'করেই তো। তোমার ওইটুকুই তো দেখতে পারিনে আমি।'

নিরুদির হাসি এবারে দেয়ালে দেয়ালে কাঁপন ধরাল। বেশ খানিকটা পর সামলাতে পারলেন।

'কাকে বিয়ে করবি, তাও কি ঠিক করে ফেলেছিস নাকি? এদের মধ্যে কেউ?'

মেয়েটা ফাজিলও বটে।

মুখ টিপে হেসে জবাব দিল, 'বিচিত্র কি, হতেও পারে।'

নির্মলার কাছ থেকে রসিকতা আশা করিনি। যে রকম সেকেলে ধরনের মেয়ে, ও যে নিরুদির সঙ্গে তাল ঠুকে চলবে, ভাবিইনি। নিরুদিও ছাড়বার পাত্রী নন। নির্মলার জবাব পেয়ে প্রথমটা একটু থমকে গেলেন, হয়তো বা গম্ভীরও হলেন কিছুটা। কিন্তু সে ক্ষণিক। পরমূহূর্তেই খিল খিল করে হেসে উঠলেন স্বভাবসিদ্ধভাবে।

'কাকে রে, এই এইটাকে না কি?'

চমকে উঠলাম। নিরুদির গলায় ছিল প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ। আমার মুখচোখে রক্ত চল্‌কে উঠল। নির্মলাও লজ্জা পেল বোধ হয়। ধ্যেত, বলে পাশের ঘরে চলে গেল। আমার বেজায় রাগ হলো।

নিরুদির বিদ্রূপটা ফিরিয়ে দেবার জন্য তিক্তভাবে বলে উঠলাম, 'আর পাত্রী পেলেন না নিরুদি! শেষ পর্যন্ত একটা নির্বোধ, গেঁয়ো, প্রতিক্রিয়াপন্থী মেয়ে জোটাতে চাইলেন। বেশ পছন্দ আপনার।'

হঠাৎ থেমে গেলাম। নির্ম্মলা চা নিয়ে ঢুকছে। আমার কথাগুলো শুনতে পেয়েছে সন্দেহ নেই। ওর মুখের তেলতেলে ভাবটিতে কোনো [illegible]ান্তর দেখলাম না। হয়তো লজ্জাই পেয়েছিলাম। হঠাৎ উঠে বেরিয়ে পড়লাম। কিসের থেকে কি হয়ে গেল। হঠাৎ রেগে গিয়ে যে অভদ্রতাটা করলাম, সেই লজ্জায় যে-ক'দিন কলকাতায় ছিলাম সেবার, আর নিরুদির বাড়ীমুখো হইনি।

প্রায় ন' মাস পরে কলকাতায় ফিরলাম। শ্রমিক আন্দোলন করি। পার্টির নির্দেশে সংগঠনের কাজে বাইরে কাটাতে হলো এ কয় মাস। নিরুদি সে ব্যাপারে কিছু মনে করেননি, তা তাঁর

চিঠির মারফতেই জেনেছি। দিব্যি দিয়ে অনুরোধ করেছেন, কলকাতায় ফিরেই যেন দেখা করি।

তবু বাধোবাধো ঠেকছিল নিরুদির বাড়ীতে ঢুকতে। শেষ পর্যন্ত সব সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে দিলাম। উঠে গেলাম দোতলায়। নিরুদি ছিলেন না, শুধু নিশীথবাবু অর্থনীতির উঠোনে দানা খুঁটে ফিরছিলেন। আমাকে দেখেই জি ডি এইচ কোলকে ঘুম পাড়িয়ে মোটা চশমাটা খুলে রাখলেন। তারপর গব্‌দা গব্‌দা হাত দু'খানা বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন।

'বিপ্লবীপ্রবর যে! এস এস। তারপর কোত্থেকে?'

'আপাতত এখান থেকেই। তা কলেজ যাননি যে? গিন্নী কোথায়?'

'আরে বসো বসো। কলেজ বন্ধ। আর আমার গিন্নী যেদিন থেকে তোমাদের নিরুদি হয়েছেন, সেদিন থেকেই কপালে চড় মেরে হদিস রাখা ছেড়েছি।'

হা-হা করে হেসে উঠলেন। খুব জমাটি লোক। এ কথায় সে কথায় ঘণ্টাখানেক কাবার হবার পর সিঁড়িতে নিরুদির সাড়া পেলাম। নিরুদি ঢুকলেন, পেছনে নির্মলা। নির্মলাকে দেখে হাঁ হয়ে গেলাম। এ কী পরিবর্তন! দিব্যি হাল-ফ্যাশানে শাড়ি পরেছে, তার সঙ্গে মানানসই চুলবাঁধা আর প্রসাধন। সেই গ্রাম্য জড়তা নেই। এসেছে শহুরে ক্ষিপ্রতা। আমার মনে হলো, আগেই [illegible] ছিল ভাল। ওর চেহারায় গ্রাম্যতাটাই মানানসই। এমনিতেই ও কুরূপা। গ্রাম্য লাবণ্য তাতে বরং কিছু শ্রী যোজনা করেছিল। শহরের স্মার্টনেসে সেটুকু নষ্ট হয়েছে। ওকে বড় উগ্র দেখাচ্ছে, একটু যেন চটুল, অশ্লীলও বা। নির্মলা হেসে ভেতরে ঢুকে পড়ল। নিরুদি ধপাস্ করে বসে পড়লেন পাশে।

'একটু রোগা হয়ে গেছিস। চুল ছাঁটিসনি কেন?'

নিরুদির এই সস্নেহ জিজ্ঞাসাবাদে ছন্নছাড়া মনে শান্তির প্রলেপ

বুলিয়ে দিল। কৌতূহল দমন করতে পারলাম না। সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে বসলাম।

'নির্মলা সেনের ব্যাপারটা কি ?'

আমার বিমূঢ় ভাব দেখে নিরুদি হেসে ফেললেন।

'বড় যে সেদিন ঠোঁট উল্টেছিলি। এবার প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দিচ্ছে। আর কত কাজ করে জানিস ? টালিগঞ্জ ধানকল মজতুর ইউনিয়নের ও সম্পাদিকা হয়েছে এবার। ছ্যাখ না, নারী শ্রমিক আন্দোলনের ফোরফ্রণ্টে ও এল বলে। এমন খাটিয়ে কর্মী আর দুটি দেখিনি।'

বিদ্রূপ করে বললাম, 'আবার শ্রমিক আন্দোলন কেন ? ঘর-সংসারের ভবিষ্যৎ কি হলো ?'

নিরুদি হেসে বললেন, 'বড় উপর উপর দেখে তোরা বিচার করিস। চামড়ার নীচে কার কি আছে, তা কি বলতে পারিস ? হৃষীকেশকে নির্মলার ভার তুলে দিয়েছি। কি করলে ছ্যাখ। ঘর-সংসার সব ছুটিয়ে দিয়েছে। ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছিল দেশে থাকতে, হৃষীকেশ এইবারই ওকে পরীক্ষা দেওয়াবে। তাছাড়া পলিটিক্‌সেও ওর মাথা বেশ।'

নিরুদির কথা শুনে নির্মলার উপর যতটা শ্রদ্ধা বাড়ল, তার দ্বিগুণ বাড়ল হৃষীকেশদার উপর। অক্লান্ত কর্মী হৃষীকেশদাকে বরাবরই শ্রদ্ধা করি। জেলে-জেলেই কেটে গেছে তাঁর যৌবনের অধিকাংশ দিন। কি আত্মত্যাগ! প্রায় চল্লিশ বছর বয়স, কিন্তু এখনো কি তারুণ্য! ওঁর সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে আমরাও পেরে উঠতাম না। তাই শ্রদ্ধা করতাম, ভয় করতাম ওঁকে। একদিনের কথা মনে আছে, বলেছিলেন, আর তো কিছুই চাইনে ভাই। টাকাকড়ি, পদ-পজিশন কিছুরই আকাঙ্ক্ষা নেই। পার্টির ইতিহাস যেদিন লেখা হবে, সেখানে যদি লেখা থাকে এই হৃষীকেশ বসু—এই বিশ্বস্ত কমরেড তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন যথাযথভাবে—তবেই আমি কৃতার্থ। এই হৃষীকেশদাই আমার আদর্শ।

নির্মলা চা করে আনল। আমি খেতে লাগলাম, ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খোঁজখবর নিতে লাগল। রেল শ্রমিক সংগঠনে কাজ করি। শ্রমিকদের অবস্থা, সংগঠনের শক্তি, সব এক এক করে জেনে নিল নির্মলা। দেখলাম নির্মলার আগ্রহ, দেখলাম ওর প্রকৃত কর্মী রূপটি। ওর উপর শ্রদ্ধা হলো, ওকে বড় ভাল লাগল। বিরূপ মনোভাব কোনোকালে পোষণ করেছিলাম, এজন্য নিজের উপর আজ লজ্জা হলো। তিরস্কার করলাম নিজের বুর্জোয়া মনকে।

সে রাত্রে নিরুদির ওখানে থাকলাম। পরদিন সকালে নিরুদি হৃষীকেশদার সঙ্গে কোথায় বেরিয়ে গেলেন। আমিও বেরুবো, দেখি নির্মলা। সাজগোজ সারা করে বাইরের ঘরে হাজির।

'এই যে, কোথায় বেরুচ্ছেন, বা, রে! দিদি বলে গেল আমার সংগঠনের অফিসে আপনাকে নিয়ে যেতে, যাবেন না?'

'তাই নাকি, আমাকে তো কিছু বলে গেলেন না!'

'কেন, আপনার কি তাড়া আছে?'

'না।'

'তবে আর কোনো ওজর চলবে না, চলুন। আপনারা হলেন ঝানু কর্মী, আপনাদের কাছ থেকে কত শিখবার আছে। চলুন তো, ভুলচুকগুলো দেখিয়ে দেবেন। জানেন, সামনের ডিসেম্বরে সারা বাঙলা ধানকল মজদুর সম্মেলন ডাকব ভাবছি। পেরে উঠব কি না, সেইটাই কথা। একে তো এরা সংগঠন-ফংগঠনের ধার ধারে না। কবে যে এদের মধ্যে চেতনা আসবে!'

নির্মলার সঙ্গে সমস্ত দিন ঘুরলাম ঢাকুরে আর টালিগঞ্জে আর শা'পুরের ধানকলগুলোতে। বিকেল নাগাত গলিতঘর্ম দু'জনে ফিরছি। নির্মলা আমার হাতে আবেগভরে একটা চাপ দিল। ওর চোখ দুটো জ্বলজল করে উঠল।

'কমরেড, যশ চাইনে, পদ চাইনে, কিছুই চাইনে। যেদিন পার্টির ইতিহাস লেখা হবে, সেই ইতিহাসের কোনোখানে যদি একটা

লাইনও লেখা থাকে—নির্মলা সেন—এই বিশ্বস্ত কর্মী কর্তব্য করে মরেছে—তবেই আমার সব পাওয়া হয়ে গেল !'

বুঝলাম কোন মন্ত্রে হৃষীকেশদা নির্মলার নবকলেবর দান করেছেন।

নির্মলার ম্যাট্রিক পাশের খবরে ওকে টেলিগ্রাম করে অভিনন্দন জানালাম। উত্তরে ও লিখল একখানা সংক্ষিপ্ত চিঠি। ২৭শে ডিসেম্বর আমাদের সারা বাঙলা ধানকল শ্রমিক সম্মেলন। অবশ্য করে আসবেন।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি জেলে গেলাম রেল-ধর্মঘটের ব্যাপারে। ছাড়া পেলাম মার্চে। প্রায় বছর দেড়েক বাদে কলকাতায় ফিরলাম। বিকালে নিরুদির সঙ্গে দেখা। বাড়ীতেই ছিলেন। নিরুদি স্বভাবসিদ্ধ হাসিটা হাসলেন।

'কবে ছাড়া পেলি ?'

'পরশু সকালে।'

'বাড়ী যাসনি ?'

'না, তবে যাবার পথেই।

'আজ তাহলে থেকে যা।'

আমারও ইচ্ছে তাই। নির্মলার কাছ থেকে ধানকল শ্রমিক সম্মেলনের খবরটা নিতে হবে। কিন্তু তখন নির্মলাকে কোথাও দেখলাম না। রাত্রে খাবার সময়ও এসে পৌছাল না।

'নিরুদি, নির্মলাকে দেখছিনে ?'

নিরুদির সদা-হাসি মুখটা একটু কালো হয়ে গেল। তবে সে ক্ষণিক।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'নির্মলা আমার এখান থেকে চলে গেছে।'

চমকে উঠলাম।

'সে কি ! কেন ? কোথায় গেল ?'

'ঝগড়া করে চলে গেছে। কোথায় আছে জানিনে। খবর দেয়নি, পাইওনি।'

নিরুদিকে বড় ক্লান্ত মনে হলো।

বাড়ী গেলাম। সেখান থেকে কর্মস্থলে। যুদ্ধটা একটা সুযোগ এনে দিয়েছে। পাছে ধর্মঘট বাধে, যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় ব্যাঘাত জন্মে, এই আশঙ্কায় শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া মানবার দিকে ঝোঁক দিয়েছেন সরকার। তাই সংগঠনের ফুরসত নেই। নিরুদির চিঠি অনিয়মিত হতে হতে আসা বন্ধ হয়ে গেল। এমন সময় একদিন হঠাৎ নির্মলার কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম। লিখেছে, নিরুদি মরতে মরতে বেঁচে উঠেছেন। ডাক্তারের মতে বায়ু পরিবর্তন দরকার। আপনার ওখানে কি সুবিধে হবে? যাব আমি, নিরুদি আর হৃষীকেশদা।

টেলিগ্রাম করে দিলাম আসতে। কার্শিয়াং-এ দুটো ঘরের বন্দোবস্তও করে ফেললাম।

ওঁদের আনতে স্টেশনে গিয়েছিলাম। দেখা হতেই নিরুদি হাসলেন। শক্ত একটা অসুখ করতে হয়েছে, তাই খুব কাহিল হয়ে পড়েছেন। নির্মলার আরো একটু মাংস লেগেছে। ও-ও হাসল। হৃষীকেশদার কোনো পরিবর্তন নেই। তেমনি গম্ভীর, তেমনি ব্যস্ত। দু'দিনের বেশী থাকতে পারলেন না, প্রচুর কাজ পড়ে আছে।

একদিন নির্মলাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় পালিয়েছিলেন ঝগড়া করে!'

নির্মলা জবাব দিল না, শুধু হাসল।

নিরুদি বললেন, 'যত পাগল নিয়ে হয়েছে আমার জ্বালা। গেল তো গেলই, কোনো খোঁজখবর নেই। পরে শুনলাম মেয়ে চাকরি করছেন। থাকেন ওয়াই ডবলিউ সি এ'তে। বড় রাগ হলো। গড়ে-পিটে যাকে মানুষ করলাম, তার পাখা গজালো কি অমনি সুড়ুত। আমিও আর খোঁজখবর করলাম না। তারপর তো পড়লাম অসুখে। পর পর অজ্ঞান হয়ে যাই। একদিন জ্ঞান হতে চোখ

খুললাম। দেখি মূর্তিমতী শিয়রে বসে পাখা করছেন, ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। বলল, ঘাট হয়েছে দিদি, আমায় মাপ করো। ওই যে মেয়ে এল, আর গেল না। চাকরি গেল, জিনিসপত্র কোথায় রেখে এসেছিল তা গেল। দিনরাত নেই, খাওয়া-দাওয়া নেই, আমাকে চাঙ্গা করে তুলল।'

নির্মলার চোখ ছলছল করে উঠল।

'বেঁচে যে উঠেছ এই আমার ভাগ্যি।'

নিরুদি হাসলেন। গলাটা তখনো ধরা ধরা।

'বেঁচে গেলাম মেয়েটার সেবার জোরে।'

নির্মলা এবার তাড়া লাগালো।

'থামো তো এবার। সেই থেকে শুধু বকবকানি চলছে।'

ওঁরা কলকাতায় যাবার পর পৌঁছ-সংবাদটা নির্মলাই দিয়েছিল। তারপর আর কোনো চিঠিপত্র পাইনি। আমার চিঠির জবাব এল ছ'মাস পরে। নিরুদি লিখেছেন। শরীর ভাল আছে। তবে মনটা বিশেষ ভাল নেই। নির্মলা এখানে নেই। ওকে বাড়ী থেকে বের করে দিতে বাধ্য হয়েছি। ওর মতো মেয়েকে কোনো ভদ্রলোকের বাড়ীতে রাখা চলে না। শুনছি নাকি 'ওয়াকাই'তে ভর্তি হয়েছে। এই ওর উপযুক্ত কাজ। পার্টি থেকেও ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। হৃষীকেশ নিজেই প্রস্তাব এনেছিল। আর কি?

চিঠিখানা পেয়ে বেশ বিস্মিত হয়েছিলাম। নিরুদি যে কাউকে বাড়ী থেকে বের করে দিতে পারেন এ আমার কল্পনার অতীত, তাও আবার নির্মলাকে। অপরাধ নিশ্চয়ই গুরুতর, নইলে হৃষীকেশদা নিজে ওকে পার্টি থেকে তাড়িয়ে দেন? নির্মলার প্রতি মনটা একটা অহেতুক বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। তেমনি নিরুদি আর হৃষীকেশদার উপর শ্রদ্ধা বাড়ল গভীরভাবে। নির্মলা যে ওঁদের কতখানি ছিল আমার চেয়ে তা আর কে বেশী জানে। তবু কর্তব্য

কর্তব্যই। সবার উপর পার্টিই সত্য।

অনেক দিন কলকাতায় যাইনি। নিরুদিদের খোঁজখবরও পাইনি। ডি টি এস সাহেবের দুর্ব্যবহারে লালমণিরহাটে হঠাৎ ধর্মঘট হয়ে গেল। কলকাতা থেকে এত তাড়াতাড়ি কেউ আসতে পারলে না। আমাকে ছুটতে হলো। লালমণিরহাট পৌঁছে দেখি হুলুস্থুলু কাণ্ড। কোথাও শৃঙ্খলা নেই। সারাদিন ছুটোছুটি করলাম। সংগঠনের অফিসে আর ডি, টি, এস, সাহেবের দপ্তরে। সন্ধ্যে পর্যন্ত কোনো মীমাংসা হলো না। কোনো পক্ষই গোঁ ছাড়বে না। কেউ নিজের কোটের বাইরে পা দেবে না। মিটমাট হয় কি করে? এদিকে অবস্থা গুরুতর। দু-দুখানা মিলিটারি স্পেশাল আটকা পড়ে গেছে। শেষে প্রাণপণ চেষ্টায় রাত আটটা নাগাত একটা বোঝাপড়া হলো। কর্তৃপক্ষ দোষ কবুল করলেন, ক্ষমা চাইলেন। শ্রমিকেরাও কাজে যোগ দিল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

এতক্ষণে মনে পড়ল সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। সমস্তটা দিন হৈ হৈ করে কেটেছে। খাওয়ার কথা মনেই পড়েনি। সুযোগ পেয়ে ওত-পাতা ক্ষিধেটা প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করল। প্লাটফরমের উপর রেস্তোরাঁ। রেল-লাইন টপকে যেই প্লাটফরমে উঠেছি অমনি মুখোমুখি নির্মলা সেনের সঙ্গে দেখা। আঁটসাঁট জঙ্গী কোর্তা আর টুপীতে ভারী কুৎসিত লাগছে দেখতে। চোখের নীচে গভীর দুটো কালো দাগ। সারা গায়ে থসথসে মাংস। এমন কি আমাকে দেখে যে হাসিটা ফুটল ওর ঠোঁটে সেটাও যেন একটু অস্বাভাবিক লাগল। তবু কেন জানিনে খুশীই হলাম। আমাকে মৃদু হাসতে দেখে ও একেবারে কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল।

'তাহলে এসব আপনার কীর্তি। খুব আন্দোলন করছেন তো। সারাটা দিন আটকা পড়ে থাকলাম। তা এক পক্ষে ভালই হয়েছে। আপনার সঙ্গে দেখাটা হয়ে গেল।'

'আপনি চলেছেন কোথায়?'

'আপাতত আমাদের বাহিনী তো ইম্ফল যাচ্ছে শুনছি। তারপরে যমালয়েও যেতে পারি কি জাপানীদের হাতে পড়ে গেইসাও হতে পারি।'

খিল খিল করে হাসল নির্মলা। সেই ছেলেমানুষী ভাবটা এখনো আছে ওর। ওকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়লাম। খাবার আনতে হুকুম দিলাম।

'আর কতক্ষণ এখানে আটকা থাকব বলুন তো?'

ওর উষ্মা দেখে হেসে ফেললাম।

'আর এক ঘণ্টার বেশী নয়।'

খুব বিস্মিত হলো নির্মলা। তারপরই হতাশ হলো বলে মনে হলো। কিন্তু সেও ক্ষণিক। তারপরই খিলখিল করে হেসে উঠল।

'কি রকম মজা তাই দেখুন। সারাদিন আটকা রইলাম এই নির্বান্ধব পুরীতে। একেবারে একা। মন বিরক্তির শেষ সীমায় পৌঁছে চলে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল। আর দেখুন এখন যেই একজনের দেখা পেলাম, মন খুশী হয়ে খুঁটো গেড়ে বসবার মতলব করল, অমনি হুকুম এল যাত্রা করবার।'

খাবার এল। যে প্রশ্নটা এতক্ষণ ঘুরপাক খাচ্ছিল মনে, খেতে খেতে সেটা করেই ফেললাম।

'কি ব্যাপার বলুন তো? নিরুদির ওখানটা ছাড়লেন কেন?'

'কেন আবার, চাকরি নিলাম বলে। আচ্ছা ওসব কথা থাক, আপনার খবর বলুন। বিপ্লব কেমন চলছে?'

'বিপ্লবের খবরে আপনার আর দরকারটা কি?'

বোধ হয় কণ্ঠস্বরটা একটু নীরস ঠেকল, তাই নির্মলা অপ্রতিভ হয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি করে বলে উঠল, 'ওসব কথা থাক। আচ্ছা, আর ক'দিন এই বাউণ্ডুলেপনা করে বেড়াবেন। এভাবে তো চিরদিন চলবে না। বরঞ্চ সময় থাকতে বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার করুন, বুঝলেন?

নইলে তো হবেন আরেকটা হৃষীকেশদা।'

মনে মনে চটে উঠলাম। নির্মলা সেই নির্মলাই আছে। তেমনি প্রতিক্রিয়াশীল, তেমনি বুর্জোয়া ভাবালুতায় টইটুম্বুর। হৃষীকেশদা আর নিরুদির সংস্রবে এসে যেটুকু পরিবর্তন হয়েছিল তা শুধু চামড়ার উপরকার। এতক্ষণে বুঝলাম, কেন হৃষীকেশদা ওকে পার্টি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বহুদিনের পুষে-রাখা অবজ্ঞাটা আবার চাড়া দিয়ে জেগে উঠল। আমাকে চুপ করে ভাবতে দেখে নির্মলা খিলখিল করে হেসে উঠল।

'কেমন, কথাটা মনে ধরল না বুঝি ?'

আর চেপে রাখতে পারলাম না। মনভরা বিরাগ, বিতৃষ্ণা, অবজ্ঞা কথা হয়ে ফুটে বের হলো।

'নিশ্চয়, খুব ধরেছে! এমন কি বিয়ের দিনক্ষণও ঠিক করে ফেললাম। শুধু ভাবছি পাত্রীটি কে ? আপনি নাকি !'

নির্মলার হাসি হাসি মুখ মুহূর্তেই কালো হয়ে উঠল। আচমকা অপমান সহ্য করতে পারল না। চোখের কোণ বেয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিল। রুমাল বের করে মুছে ফেলল। তারপর অতি শান্ত কণ্ঠে বলল—'প্রগল্ভতা ক্ষমা করবেন, আচ্ছা নমস্কার।'

নির্মলার সঙ্গে তারপর আর দেখা হয়নি আমার। দিনে দিনে ভুলেই গেলাম ওর অস্তিত্ব। উপায়ও ছিল না মনে রাখবার। আমি তখন অন্য কাজে ব্যাপৃত। চারটে মাস চরকির মতো ঘুরলাম সমস্ত উত্তরবঙ্গ আর আসামে। বাঙলা-আসাম রেল শ্রমিক সম্মেলন আসন্ন। তারই প্রস্তুতিতে ফুরসত ছিল না আর কোনো কিছুর। তাছাড়া নির্মলাকে মনে রাখবার কোনোই সঙ্গত কারণ ছিল না তো। হঠাৎ একটা জরুরী কাজে পাটনা যাবার দরকার পড়ল। কলকাতায় পৌঁছে দেখি আমার গাড়ী ছাড়তে ঘণ্টা-চারেক দেরী। কি করি এ সময়টা। মনে পড়ল নিরুদির কথা। হঠাৎ পৌঁছে চমকে দিলে কেমন হয় !

বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। নিরুদির বাসায় পৌঁছলাম। বাড়ীঘর অন্ধকার। পা টিপে টিপে বসবার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। পর্দার ও-পিঠে তখন তুমুল বচসা চলছে নিরুদি আর হৃষীকেশদাতে।

'গ্যাখো নিরু, পার্টি ছাড়বার পর তোমার অধঃপতন দ্রুত হচ্ছে।'

নিরুদি পার্টি ছেড়ে দিয়েছে! চমকে উঠলাম। সে কি! কবে? হৃষীকেশদার ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গলা শোনা গেল।

'আর সেই অনুপাতে তোমার টাকার খাঁইও বাড়ছে। এত টাকা কর কি?'

'দেনা শোধ করি। এতদিন ধরে বিপ্লবীগুষ্টিকে যা খাইয়ে এসেছি তারই দেনা, বুঝলে?'

'সেই থেকে দেনাই শোধ করছ? এত দেনা জমেছে? নির্মলার টাকাগুলোতেও কি দেনা শোধ করেছ?'

'নির্মলার টাকা নিয়েছি তোমায় কে বলল!'

'যেই বলুক। ব্যাচারার এভাবে সর্বনাশ করা তোমার ঠিক হয়নি।'

নিরুদির আওয়াজ বেশ কিছুক্ষণ শোনা গেল না। চলে আসব ভাবছিলাম।

এমন সময় নিরুদি বলে উঠলেন, 'নির্মলার সে টাকা আমি শোধ করে দিয়েছি।'

'শোধ করে দিয়েছ! তাই বুঝি তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে।'

'সেইটেই ভুল করে ফেলেছি হৃষীকেশ। তোমাকেও সেই সঙ্গে তাড়ানো উচিত ছিল।'

'কি, কি বললে?'

'ঠিকই বলছি। এই পড় নির্মলার চিঠি। সেই টাকার প্রাপ্তি-সংবাদ জানিয়েছে। আর যা জানিয়েছে তা নিজেই পড়।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। আমি বুঝতে পারছিলাম না কি

ব্যাপার ঘটছে। হৃষীকেশদা বলতে গেলেন, 'এ, এ মিথ্যে কথা।'

নিরুদি ধমকে উঠলেন।

'থামো। আমি নিজেও এর প্রমাণ পেয়েছি। আমার অসুখের সময় প্রতিটি রাত্রে তুমি নির্মলার ঘরে ঢুকেছ। কার্শিয়াং থেকে ফিরে আসবার পরও। একদিন আমি নির্মলাকে ধরে ফেলি। ও কিছুতেই কোনো কথা বলতে চায়নি, বলেওনি। ওর তখন বড় আশা তোমাকে বিয়ে করবে। আমি ভেবেছিলাম অপরাধটা ওর। ওকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু এখন বুঝছি, অপরাধী নির্মলা নয়, অপরাধী তুমি। তুমি ওর সর্বনাশ করলে, কিন্তু বিয়ে করবার বেলায় নারাজ হলে। উল্টে পার্টি থেকে দিলে তাড়িয়ে।'

হৃষীকেশদা গর্জন করে উঠলেন, 'চোপ চোপ, নচ্ছার মাগী।'

আর না। আর থাকা উচিত নয়। বেরিয়ে চলে এলাম। নির্মলা সেনের আর কোনো খবর পাইনি। আর খোঁজখবর পাব কি না, তাও জানিনে। তার খবরে আমার দরকারই বা কি? তবু—

ছয়

সাগিনা মাহাতো

বসন্দা, দিন্দা, করবীদি, শরৎদা—এদের কাহিনী তো দিব্যি বলতে পেরেছি: একটুও বাধেনি। তবে সাগিনার কথা বলতে গিয়ে বার বার হোঁচট খাচ্ছি কেন?

তিন বছর ধরে চেষ্টা করেছি সাগিনার কাহিনী বলবার কিন্তু কিছুতেই মনের মতো করে বলতে পারছিনে। অথচ সাগিনাকে বাদ দিলে চেনামুখের উজ্জ্বল মুখটাই বাদ পড়ে যায়।

সাগিনার কথা মনে হলেই ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসের সেই হাড়কাঁপানো সকালটার কথা আমার মনে পড়ে।

জমাট কুয়াশায় হিমালয়ের পাদ স্টেশনটা ঢেকে গিয়েছিল সেদিন। দার্জিলিঙ মেলের শার্সি তোলা ভ্যাপসা থার্ড ক্লাস কামরা থেকে প্ল্যাটফরমে নামার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হয়েছিল, ঠাণ্ডা করাত দিয়ে পা দুটো কে বুঝি কেটে নিল। শীত যে এমনভাবে কামড়ায় সে ধারণা আগে কখনো ছিল না।

জিনিসপত্র সামান্যই। সেগুলো হাতে নিয়ে সামনেই যে পাহাড়ী কুলিটাকে পেলাম তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সাগিনাকে চেনো?'

সে আমাকে বেশ করে দেখে নিলে, তারপর কথার জবাব না দিয়েই চলে গেল।

পকেটে পয়সাকড়ি প্রায় নেই। কাল দুপুরের পর থেকে পেটেও বিশেষ কিছু পড়েনি। সারা রাত ট্রেনে তো প্রায় দাঁড়িয়েই কেটেছে। তার উপর সকালের শীতের এই অসহ্য বোঝা। মনে হচ্ছিল, এক্ষুনি যদি গরম কিছু পেটে না পড়ে, যদি আগুনের তাতে হাত-পা সেকতে না পারি তো মরে যাব।

এই অচেনা নির্বান্ধব পুরীতে দু'জন লেককে জানি। এক কমরেড কাজিমন। সে আমার বন্ধু। আর যার কাছে এসেছি, সেই সাগিনা। এই বছরই এপ্রিল মাসে তাকে প্রথম দেখি। ঝরিয়ার শ্রমিক সম্মেলনে। কাজিমনই তাকে এনেছিল।

কাজিমনকে এখানে পাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। সে থাকে খার্সাং-এ। এখানে এক সাগিনাই আমার ভরসা।

কিন্তু কোথায় সাগিনা? যাকে শুধাই, সেই মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। স্টেশম ঘরে ঢুকে দু'একজন রেলবাবুকেও জিজ্ঞাসা করলাম। তাতে তাঁরা খেঁকিয়ে উঠলেন। কে সাগিনা? ও সাগিনা ফাগিনা কাউকে চিনি না মশাই।

অগত্যা স্টেশন থেকে বেরিয়ে বাজারে এলাম। সেখানে একটা ছোট চা-খানায় ঢুকে চা খেতে খেতে একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, পাহাড়ী রেলের লোকো শেড্‌টি কোথায়?

লোকটির কথায় জানলাম, একটু দূরেই হবে জায়গাটা। পাহাড়ী রেলের এই ছোট লাইন ধরে এগিয়ে যেতে হবে। একটা ছোট স্টেশন পড়বে। সেখান থেকে ডানহাতি মোড় ঘুরে একটা ছোট বাজার। বাজরের ভিতর দিয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে গেলেই লোকো শেড্ মিলবে। মহানন্দার কাছ বরাবর।

আকাশের গতিক দেখে মনে হলো, যে কোনো সময় বৃষ্টি নামবে। হাওয়া দিচ্ছে এলোমেলো। পথ ধরে হাঁটছি। ধকস্ ধকস্ করতে করতে ছুটো ইঞ্জিন খানকয়েক গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে। শৈলাবাসে চলেছে। সামনের ইঞ্জিনের বাফারের উপর ছুটো পাহাড়ী বালি হাতে বসে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কি বলছে তারা। কমলালেবুর পাহাড় তৈরী হয়েছে এখানে ওখানে। চেঁচামেচি চলেছে বেজায়। গোটা কয়েক বাস এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাত্রী ঠুসছে পেটে। হুস-হাস ট্রাক, মোটর-কার চালিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ী ড্রাইভার। আমার মন কাউকেই তেমন করে দেখছে না। যদি সাগিনাকে না পাই ?

অনেকখানি হেঁটেছি। হাঁটতে ভাল লাগছে। ভিতরটা একটু গরমও হয়েছে। এই তো সেই স্টেশন। ঐ বুঝি সেই রাস্তা। হ্যাঁ, এই যে বাজারটা।

ছু-চার পা সেদিকে এগিয়ে যেতেই দেখি এক চা-খানার সামনে তুমুল হাঙ্গামা বেধে গেছে। একটা পাহাড়ী মেয়ে ঝাঁটা দিয়ে একটি লোককে দমাদম পিটছে। সেও মেয়েটাকে কিল ঘুঁষি লাথি চালাচ্ছে। লোক জমে গেছে চারদিকে। মজা দেখছে সবাই। আমি তো ঘাবড়ে গেলাম। হঠাৎ হৈ হৈ বেড়ে গেল। সিটি পড়তে লাগল স্যুঁই স্যুঁই। কি হলো, দেখতে গিয়েই আমি থ। ঝাঁটার ঘায়ে অস্থির হয়ে লোকটা মেয়েটার কাপড় ধরে মেরেছে এক টান। সেই টানে বিবস্ত্রা হয়ে বেকুব বনে গেছে মেয়েটা। বিনা পয়সায় এমন জমাটি খেল দেখে জনতা আহ্লাদে সিটি বাজিয়ে চলেছে।

হঠাৎ কোত্থেকে সাগিনার আবির্ভাব হলো। মুহূর্তের মধ্যে সব তছনচ হয়ে গেল।

'শালে কুত্তাকে বাচ্চা' বলে সাগিনা লোকটার ঘাড় ধরে শূন্যে তুলে ফেলল। মনে হলো একটা বাঘের থাবায় নেংটি ইছুর ঝুলছে। আরেকটা থাবা দিয়ে সাগিনা তার গালে মারলে চড়। লোকটার

কস বেয়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে পড়ল। তারপর সাগিনা তাকে ছেঁড়া বস্তার মতো ছুঁড়ে ফেলে দিল। জটলার দিকে চেয়ে খ্যাপা গেরিলার মতো হুঙ্কার ছাড়ল, 'ভাগো শালা সব।'

মুহূর্তের মধ্যে তামাসা মাটি। জায়গা ফাঁকা হয়ে গেল।

চা-খানায় ঢুকে মেয়েটা কাপড় পরে নিল। সাগিনা তার পাশে গিয়ে বসল। লোকটাও গা ঝাড়া দিয়ে উঠে এল। আমিও এক পাশে বসে পড়লাম। আমার মনে হলো, বাহাদুর মার্কা ইংরাজী সিনেমার একটা দৃশ্য যেন এইমাত্র দেখলাম।

সাগিনা আমার দিকে ভ্রূকুটি করে চাইতেই বললাম, 'কমরেড সাগিনা, আমি কলকাতা থেকে আসছি।'

সাগিনা একবার শুধু বলল, 'কলকাত্তেকে কামরেড? আচ্ছা, ঠিক হ্যায়, পিছু বাত হোগা।'

তারপর আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে পাহাড়ী মেয়েটিকে মোলায়েমভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'তুই কে?'

মেয়েটি একটু হেসে বললে, 'ললিতা।'

এতক্ষণ পরে সাগিনার স্বভাব-রুক্ষ বিরাট চাকার মতো মুখখানা একটু যেন কোমল হয়ে উঠল। খপ করে ললিতার থুতনিটা ধরে ওর মুখটা একটু তুলে ধরলে, কিছুক্ষণ মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকলে।

তারপর বলল, 'বাঃ, তুই তো বেশ খুবসুরৎ।'

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠল। সত্যি, ভাল করে চেয়ে দেখলাম, ললিতা সুন্দরী বটে।

সাগিনা বলল, 'ও তোর কে হয়?'

ললিতা বলল, 'দুষমন।'

তারপর আবার খিলখিল করে গড়িয়ে পড়ল হেসে

লোকটা এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল।

গর্জন করে বলে উঠল, 'ও আমার আওরাত। পালিয়ে এসেছে ঘর থেকে।'

ললিতার দিকে চেয়ে বলল, 'চল ঘরে। দুষমনি বার করব। জিন্দা পুঁতে ফেলব।

রাগে অপমানে সেই পাহাড়ী মুখ আগুনের মতো লাল হয়ে উঠল। ললিতা সাগিনার কাছ ঘেঁষে সরে বসল। তারপর লোকটার দিকে অবহেলার থুথু ছুঁড়ল। থুঃ।

সাগিনা ললিতার একটা হাত আলতোভাবে চেপে ধরল।

লোকটার দিকে কটমট করে চেয়ে বলল, 'আগর জান কি পরোয়া হ্যায় তো ভাগ হিঁয়াসে। জান থাকলে বহুৎ আওরৎ মিলবে।'

লোকটা বাঘের মতো চোখে একবার ললিতাকে, আরেকবার সাগিনাকে দেখে নিল। তারপর কোনো কথা না বলে চলে গেল।

সাগিনা ললিতার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললে, 'নে হয়েছে? গিয়েছে তোর দুষমন? আখুন তুই কোথায় যাবি বল?'

ললিতা খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে বলল, 'আমি কি জানি?'

মিটমিট করে হেসে সাগিনা বলল, 'তো যা তোর দুষমন তো ভেগেছে, এবার কোথায় যাবি চলে যা।'

ললিতা একটু অবাক হয়ে সাগিনার দিকে চাইল। কিন্তু সে একটুক্ষণ, তারপরেই তার মুখে কেমন এক দুষ্টু হাসি ফুটে উঠল। হাসতে হাসতেই উঠে পড়ল। পোশাকটা ঠিকঠাক করে নিল। তারপর দরজার দিকে পা বাড়াল।

সাগিনা খপ করে হাতটা ধরে বলল, 'বহুৎ আচ্ছা। খুব আচ্ছা জবাব দিয়েছিস। চল, তোর একটা ঠিকানা করে দিই।'

সাগিনা উঠে পড়ে দেখে আমি ওকে বললাম, 'কমরেড সাগিনা, আমি কলকাতা থেকে আসছি। কমরেড মিত্র আমাকে পাঠিয়েছেন তোমার কাছে।'

এতক্ষণ আমার কথা ওর মনেই ছিল না। যেন এইমাত্র আমাকে দেখল।

বলল, 'হাঁ হাঁ। কলকাতার কমরেড, ঠিক হ্যায়। হবে, তোমার সঙ্গে বাতচিত হবে। পিছে হবে। দেখছ তো, আধুন ব্যস্ত আছি। কাল পরশু দেখা হবে।'

বলেই দরজার দিকে পা বাড়াল। আমি মরীয়া হয়ে উঠলাম। খিদেয় তখন আমার পেটে পাক দিচ্ছে। ওকে খুঁজে বার করতেই তো দম বেরিয়ে গেছে। এখন বেলা দুপুর। দুপুরের পর বিকাল হবে। রাত আসবে। থাকব কোথায়? ওকে ছেড়ে দিলে আর কি ওর পাত্তা পাব?

একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, 'দেখ কমরেড, ব্যাপারটা জরুরী, ইউনিয়নের কাজে এসেছি। এসেছি তোমার কাছে, থাকব কোথায়?'

সাগিনা এবার আমাকে আপাদমস্তক দেখে নিল। তারপর হো হো করে হেসে উঠল।

'আরে বাহবা বাহবা। এর মতুন তুমারো ঠিকানা নেই। তো ঠিক হ্যায়, তুম্‌ভি চল হামারা সাথ। ফয়সালা একটা হবেই হবে।'

এতক্ষণে বুঝতে শুরু করলাম, যে পাল্লায় পড়েছি, সেটি নিতান্ত সোজা নয়। পার্টির নির্দেশ, এরই সঙ্গে আমাকে এখন কাজ করতে হবে। কাজিমন রিপোর্ট দিয়েছিল, সাগিনা এ অঞ্চলে এক বিরাট শক্তি। ওর ক্ষমতা যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি, তবে এ অঞ্চলে আমাদের পার্টির হবে একাধিপত্য অধিকার।

এখন সেই শক্তির খানিকটা নমুনা দেখলাম। আর দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল।

অথচ সাগিনাকে দেখবার আগে আমি মনে মনে কত খুশি হয়েছিলাম। এই প্রথম আমি সত্যিকার একজন শ্রমিকের আজ্ঞাবহ হতে চলেছি।

আমরা এদেশে যতই শ্রমিকের নেতৃত্ব বলে চেঁচাই না কেন, বরাবর দেখেছি, নেতৃত্বটি মধ্যজীবীদেরই হাতের মুঠোয় শেষ পর্যন্ত

থেকে যায়। আর মজতুর ভাইরা কলে কারখানায় যেমন মনিববাবুর হুকুম তামিল করে, তেমনি ইউনিয়নে তামিল করে কমরেডবাবুর হুকুম।

বই পড়ে কত কি শিখেছিলাম। সর্বহারাই পারে বিপ্লবকে ডেকে আনতে, কারণ সে মরীয়া, তার হারাবার কিছু নেই। শ্রেণী সংগ্রামের সেরা সৈনিক তাই মজহুর। ওদের নেতৃত্বেই একদিন সারা হুনিয়ায় পত পত উড়বে লাল ঝাণ্ডা।

কিন্তু লেবর ফ্রণ্টে কাজ করতে এসে দেখি নেতৃত্বের উপর একচেটিয়া অধিকার রয়েছে শুধু মধ্যবিত্তের। যে পাতি বুর্জোয়া শ্রেণীর উপর আস্থা না রাখবারই তামিল পেয়ে এসেছি পার্টি সাহিত্যে—কারণ পাতি বুর্জোয়া নাকি সব চেয়ে সুবিধাবাদী, শিবির বদলাতে তারা মুহূর্তের বেশী সময় নেয় না, বিপ্লবকালে এরাই দল ত্যাগ করে মালিকের পা-চাটা গোলাম বনে যায়— যাদেরকে ঘৃণা করতে শিখেছি, এখন দেখি লেবর মুভমেণ্টের তাবৎ লীডার তারাই।

আমি জন্মেছি মধ্যবিত্ত ঘরে। জন্মসূত্রে আমি সেই সুবিধাবাদী পাতি বুর্জোয়াদের শরিক। আর তাই আমার লজ্জা রাখার জায়গা ছিল না। মহাপবিত্র শ্রমিকবংশে কেন আমার জন্ম হয়নি, সে আফসোসে আমি মরমে মরে থাকতুম।

তাই তো প্রথম সুযোগেই আমি চলে এসেছিলাম সাগিনার কাছে। আমার নিজের জায়গায়। আমার আপন ঘরে। মনে মনে ভেবেছিলাম আমার জন্মের ত্রুটি শুধরে নেব সাগিনার কাছ থেকে তালিম নিয়ে।

আর সেই সাগিনার কি এই রূপ? আমার মধ্যবিত্ত মন বলছিল, শেষে কি একটা লম্পটের পাল্লায় পড়লে!

এ-বস্তি সে-বস্তি পার হয়ে আমরা তিনজন চলেছিলাম। আগে আগে সাগিনা আর ললিতা। পিছু পিছু আমি। পিছন থেকে

সাগিনাকে এক বিরাট দৈত্য বিশেষ লাগছিল।

সাগিনার চেহারাটি বিরাট। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। মাংসের একটা প্রকাণ্ড স্তূপ যেন চলেছে। ময়লা তেল-কালি মাখা ছেঁড়া এক রেলের কুর্তি গায়, পরনে টাইট পাহাড়ী প্যাণ্ট। পাশে ললিতার সুন্দর ছিপছিপে চেহারা। দু'জনে অনর্গল কথা বলছে, হাসছে। এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ছে মাঝে মাঝে।

লোকো শেড্ পেরিয়ে একটা জীর্ণ খোলার বাড়ীর সামনে এসে ওরা দাঁড়াল।

সাগিনা কর্কশ গলায় হাঁক পাড়ল, 'গুরুং, এ গুরুং।'

একটা বুড়ো পাহাড়ী বেরিয়ে এল।

সাগিনা বলল, 'দাইবুড়ি কো বোলাও।'

গুরুং ভেতরে গিয়ে এক বুড়িকে পাঠিয়ে দিল।

সাগিনা তাকে বলল, 'এ বুঢ়িয়া, তুই এই ললিতাকে তোর কাছে রেখে দে। ডাগদরবাবুকে বলে হাসপাতালে ওকে একটা কাজ জুটিয়ে দিব।'

ললিতাকে বললে, 'থাক আভুন তুই এখানে। পরে দুসরি ব্যবস্থা হবে।'

ললিতা হাসতে হাসতে বুড়ির সঙ্গে ভেতরে চলে গেল।

ললিতার ব্যবস্থা হলো, এখন আমার একটা হিল্লে হয়তো করবে সাগিনা। এর মধ্যে আমি মনস্থির করে ফেলেছি। আজ রাতটা কাটিয়ে কাল সকালেই রওনা দেব খার্সাং-এ। এ লোকের সঙ্গে পোষাবে বলে মনে হচ্ছে না। কাজিমনের সঙ্গে পরামর্শ দরকার।

সাগিনা আমার দিকে চেয়ে বলল, 'এসো আমার বস্তিতে যাই।'

সেটা আবার কোথায়? খিদে পেটে কাঁহাতক ছোটাছুটি করা যায়?

বললাম, 'কমরেড কাজিমনকে ফোনে একটা খবর দিলে হয় না!'

সাগিনা আমার দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি কাজিমনকে চিনো?'

বললাম, 'হ্যাঁ, সে আমার দোস্ত।'

'আচ্ছা!' সাগিনা বলল, 'তবে চল টিশন। টেলিফু আখুনই হয়ে যাবে।'

এতক্ষণে দেখি সাগিনা একটু নজর ফেলল আমার উপর। স্টেশনে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করল দু-চারজন বড় বড় নেতার কথা।

'কামরেড মিত্রাকে জান?'

বললাম, 'হ্যাঁ, জানি।'

'আচ্ছা, কামরেড মুকুর্জি, বানার্জি, সেন, মহম্মদ হুসেন—সবাইকে চিনো?'

বললাম, 'চিনি।'

সাগিনা আমার দিকে বেশ করে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। যেন ভাল করে আপাদমস্তক দেখে নিল আবার।

বলল, 'তব্ তো ঠিক আছে।'

স্টেশনে ঢুকতে সাগিনার যার সঙ্গে দেখা হয় এখন, সেই দেখি খানিকক্ষণ মাইডিয়ারি আলাপ করে নেয়। অথচ এইখানে জনে জনে জিজ্ঞাসা করেছি সাগিনার খবর। কেউ হদিস দেয়নি। বড় তাজ্জব ব্যাপার! কন্ট্রোল রুমে ঢুকতেই আধঘণ্টা কাবার হয়ে গেল।

দু'একজন স্টেশনবাবু সাগিনাকে দেখে গম্ভীর হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সাগিনা গ্রাহ্যও করল না। সটান এক ফিরিঙ্গী সাহেবের কাছে এগিয়ে গেল।

বললে, 'আন্টুনি সাহাব, সালাম।'

সাহেব বিরক্ত হয়ে বললে, 'ক্যায়া মতলব সাগিনা।'

সাগিনা হেসে বললে, 'সালাম দিচ্ছি সাহেব, তব্ ভি গোঁসা করছ কেন? তবিয়ত গড়বড় হয়নি তো।'

সাহেব আরো চটে গেল, 'দিক কর না সাগিনা। মতলব কি তাই বলো।

সাগিনা এবার গম্ভীর হয়ে গেল।

বললে, 'টেলিফু' করতে চাই। খার্সাং-এর লোকো অফিসের নম্বর লাগিয়ে দাও।'

সাহেব বললে, 'আবি ভাগো। হোগা নেই।'

পেছন থেকে কে মন্তব্য করলে, 'অ্যাঁ, ব্যাটার রোয়াব ছাখ। বাপের জমিদারী পেয়েছে যেন।'

সাগিনা বললে, 'সাহেব, টাইম আমারও কমতি আছে। কাম ভি জরুরী। হুজ্জৎ যদি না চাও, লাইন দাও জলদি।'

এবারে ঘরসুদ্ধ বাবুরা চটে গেল। কেউ বললে বেরিয়ে যাও, কেউ বললে নিকালো, কেউ বা বললে গেট আউট। একটা মিনিয়েল বাবুদের কাছে চোখ গরম করবে! ইয়ার্কি। রিপোর্ট কর উপরে। কোম্পানীও হয়েছে এমনি, এইসব গুণ্ডাদের জেলে না পাঠিয়ে লাই দিয়ে মাথায় তুলছে।

এক বাবু আমাকে খিঁচিয়ে উঠলেন, 'এই ছোকরা, ভাগ এখান থেকে।'

সাগিনা সব গালাগাল নির্বিবাদে শুনল। ও সব কথায় সে একটুও বিচলিত হয়েছে বলে মনে হলো না। এগিয়ে গেল এন্টনী সাহেবের কাছে।

তারপর বললে, 'সাহাব, তোমরা ভারী অফসার আছো। তাই চটপট পুরানা বাত ভুলে যাও। বস্তিবাজার কা মামলা এতনা জলদি ভুলে গেলে? থাক, আমিও সে সব কথা তুলতে চাইনে।'

হঠাৎ বাইরে কাকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে ডাকল, 'এ বাহাদুর, ইধার আও।'

জানালা দিয়ে একটা পাহাড়ী মুখ উঁকি মারল।

সাগিনা বললে, 'তুমকো আদমি লোগ সব তৈয়ার হ্যায়?'

পাহাড়ী মুখ জবাব দিলে, 'বিলকুল তৈয়ার। কিঁউ ভাই?'

সাগিনা বললে, 'এক সাহাব আর তিন বাংগালী বাবুকো দুরস্ত

করনে পড়েগা।'

পাহাড়ীটা একগাল হেসে বললে, 'বহুৎ আচ্ছা। কৰ্।'

সাগিনা এবার গোটা ঘরটায় চোখ বুলিয়ে বললে, 'সামকো আ যাও বস্তিবাজারমে। বাত্তা তুঙ্গা।'

'বহোৎ আচ্ছা।'

সাগিনা যেন নিজের মনেই বলে উঠল, 'আব কুছ্ কাম হোগা মালুম পড়তা হ্যায়। কি উ সাহাব?'

ঘরের লোকগুলো সব যেন বোবা হয়ে গেছে। এণ্টনী সাহেব সাগিনার দিকে'ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

সাগিনা বললে, 'এবার তো লাইন মিলবে সাহাব?'

দ্বিতীয় কথা না খসিয়ে সাহেব ফোনটি তুললেন। একটু পরে 'হ্যালো খার্সাং, লোকো অফিস প্লিজ্' বলেই ফোনটি সাগিনার হাতে তুলে দিলেন।

সাগিনা ফোন ধরে চেঁচাতে লাগল, 'হ্যালো কাজিমন সাহাব। হাঁ হাঁ সাগিনা। আরে, কলকাত্তাকে চিড়িয়া আয়া। বোলছে কি তুমাকে চিনে। হাঁ হাঁ, বাত করো-না।'

ফোনটি আমাকে দিয়ে বললে, 'বাত করো।'

আমার গলা পেয়ে কাজিমন খুব খুশি। বললে, আপাতত সাগিনার ওখানে থাকো। পরশু আমি যাব। তখন কামকাজের বন্দোবস্ত হবে। তুমি এখন সাগিনাকে ফোনটি দাও।

সাগিনাকে বলতে শুনলাম, 'ঠিক হ্যায়! ওর জন্যে তুমি ভেবো না। পরশু রোজ তুম আ যাও, জরুর। আচ্ছা আচ্ছা। -হাঃ হাঃ হাঃ। ফিকির মত্ করো ভাই। কৌন? জানরল ম্যানেজার। হাঃ হাঃ হাঃ। বড়ি আচ্ছি বাত। আরে দুনিয়া বদল জায়গি। উয়ো বড়া সাহাব, ছোটা সাহাব—সব শালে কো রং জ্বল জায়গা। শরমায়দারি চলেগা নেহি। আচ্ছা আচ্ছা, উয়ো সব বাত পিছে হোগা। কেয়া? আওরাত? কৌন? ও তো হো। ভুখন কি

বেওয়া ? আরে ভাই, উয়ো তো ভাগ গয়ি। মেরা কলিজা কাটকে চলি গয়ি। দো মাহিনা হো চুকা। হাঁ। নেহি, নেহি, কসুর উসুর কুছ নেহি থা। মাতোয়ালা হোকে এক রোজ ঘর পহুঁচা। সামনে পড় গিয়া উও বেচারি, মারা দো চার ঝাপড়। তো সুবে উঠকে দেখা কি, পিঞ্জরা খালি। হায় হায়। ক্যা আফসোস ! ক্যা, দুসরি কো বাত ? আরে ভাই, আরে ভাই শুনো তো। ম্যয় ক্যা মরদ নেহি হুঁ ? তো ? তো আওরাত ভি মিল জায়েগা। ও হাঃ হাঃ হাঃ। কামাল কিয়া ভাই, তুমনে কামাল কিয়া। আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক হ্যায়।'

খটাস করে ফোনটি রেখে দিল সাগিনা। খুশিতে চোখ মুখ ভরে উঠেছে।

'গুড্ মর্নিং সাহাব, হা গুড্ মর্নিং। চলো কামরেড।'

আমার পিঠে গন্দা হাতের একখানা থাপড় মেরে ঠেলতে ঠেলতে বাইরে নিয়ে এল।

সাগিনার সঙ্গে ওর কোয়ার্টারের দিকে যেতে যেতে নানা কথা ভাবছিলাম। সাগিনা, দেখলাম, সোজা পথের মানুষ। সাহেব যদি ফোন করতে না দিতে চায় তো বিচলিত হবার কিছু নেই। ধরে পিটে দাও। মরদ হয়ে সে যখন জন্মেছে, তখন তার আওরাত একজন চাই। একজন যদি চলে যায়, দুঃখ নেই, আরো কেউ জুটে যাবে।

যাবে কেন বলছি, জুটে তো গেছেই এর মধ্যে। সকালের ঘটনা মনে পড়ল। ললিতাব স্বামীকে ভাড়িয়ে সাগিনা তাকে রেখে এসেছে এক বুড়ির বাড়ীতে।

এই লোককে নিয়ে পার্টি গড়তে হবে ! বই-এ লেখা নীতিকথায় আমার কখনো বিশ্বাস ছিল না। সুনীতি দুর্নীতির মার্কসীয় ব্যাখ্যাই আমি জানি। কিন্তু তবুও, এই লোকটার সংস্পর্শে এসে অবধি তার যা ক্রিয়াকাণ্ড সব দেখলাম তাতে আমার মনটা কেন যেন খচখচ

করতে লাগল।

সাগিনা একগাল হেসে বললে, 'কামরেড, এবার খানাপিনা কিছু করা যাক। তুমি যে এসেছ সেটা খুব খুশির কথা আছে।'

ঘর বলতে সাগিনার একটাই। কিন্তু সেটা এত কদর্য, আগে বুঝতে পারিনি। আমার বিছানাপত্র কিছু ছিল না। সাগিনার বিছানাতেই শুয়েছিলাম, সাগিনার পাশেই। ওরই বোঁটকা কম্বল মুড়ি দিয়ে।

শীতের ভয়ে সেই ছোট্ট ইটের-খুপরির একটামাত্র দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আর অন্য কোনো ফাঁক-ফোকর নেই। আমরা জনা পাঁচেক লোক সেই ঘরে। ঘরটি গরম রাখতে এক কোণে একটা আগুনের মালসা জ্বলছে।

প্রচুর মদ খেয়েছে সাগিনা। ভক ভক করে তার প্রশ্বাসের গন্ধ আমার নাকের উপর আছড়ে পড়ছে। এইসব গন্ধ, মালসার ধোঁয়া, আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস –কোনোটাই বেরুতে না পেরে সেই বন্ধ ঘরে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। ভ্যাপসা চরম পীড়াদায়ক সেই আব-হাওয়ায় আমার মনে হলো, আমি দম বন্ধ হয়ে মারাই পড়ব বুঝি।

এও বুঝতে পারছিলাম, আমার এ অস্বস্তি অন্যায়। পাতি বুর্জোয়া রক্তের নাক-উঁচু সংস্কার। যতবার কথাটা মনে হচ্ছিল ততবারই যেন মরমে মরে যাচ্ছিলাম। এই আমার আপন ঘর। খাঁটি এক মজুরের আস্তানা। এমন জায়গায় থাকবার সুযোগ পাব বলেই না এখানে এসেছি। তবে কেন এই অস্বস্তি? তবে কেন আমি এত ছটফট করছি? ঘুমোতে পারছি না কেন ঐ সাগিনাদের মতো নির্বিকার ভাবে। ছিঃ? মনকে ধমক দিলাম। একটু ঘুমোতে চেষ্টা করলাম।

হঠাৎ সেই আবছা অন্ধকারে দেখি সাগিনা উঠে বসল। তারপর দুই ধাক্কায় আমাকে ঠেলে তুলল।

'কামরেড', আমার হাত দু'খানা চেপে ধরল সাগিনা। 'কামরেড,

আমাকে মাফ করে দাও। ম্যয় পাপী হু।

বুঝলাম, রাতদুপুরে মাতলামো চেগেছে সাগিনার। সেরেছে!

,সচ্ বলছি কমিরেড, একটা বুরা কাম করতে গিয়েছিলাম। মাফ করে দাও।'

এতক্ষণে বিরক্ত হয়ে উঠেছি।

বললাম, 'কমরেড, কথা কাল হবে। আজ ঘুমাও।'

'ঠিক হ্যায়। লেকিন শোনো কামরেড', সাগিনা বললে, 'তোমাকে যখুন প্রথম দেখি তখুন মনে করেছিলাম কি শালা টিকটিকি আছে। তখুন তয় করলাম কি শালাকে জানে মেরে ইঞ্জিনের বয়লাটে ফেলে দিব।'

সর্বনাশ! আমার গা দিয়ে ঘাম ঝরে পড়ল। আঁতকে উঠলাম সাগিনার কথা শুনে।

'তারপর!'

,তারপর', সাগিনা বলল, 'দেখলাম তুমি কাজিমনের সাথে বাত-চিত করলে। দেখলাম, হাঁ তোমাদের বেরাদরি পাক্কা। তখন আফসোস হলো কি তোমাকে আমি বিশোয়াস করিনি। তুমি আমাকে মাফ করে দাও কামরেড।'

সত্যি বলছি, সে রাতটা খুব ভয়ে ভয়ে কাটিয়েছি। যে সাগিনাকে চরম ভরসা বলে প্রথম রাত্তিরে নিশ্চিন্তে তার কাছ ঘেঁষে শুয়েছিলাম, এখন তাকেই সাক্ষাৎ শমন বলে মনে হতে লাগল।

সাগিনা ততক্ষণে ভোঁস ভোঁস ঘুম দিতে লেগেছে। যদিও ঘুমোনোর আগে বার বার ভরসা দিয়েছে যে তার ভুল ভেঙেছে। সে আমাকে কমরেড বলে মেনে নিয়েছে। তবু আমার ভয় যায়নি। সারারাত যেন খাটের নিচে সাপ নিয়ে শুয়ে কাটালাম।

তারপর পুরো একটি বছর সাগিনার সঙ্গে কাটল। কাজিমন কিছু বাড়িয়ে বলেনি। সাগিনার প্রতাপ সে অঞ্চলে ছিল অপ্রতিহত।

পাহাড়ী রেলের মজদুররা সাগিনা ছাড়া আর কাউকে চেনে না। আর কাউকে মানে না।

বিদেশী মালিকের বহু অত্যাচার এই রেলপথের শ্রমিকদের সইতে হয়েছে। শীতের দেশ। বর্ষার দেশ। কিন্তু কি সব ভাঙ্গাচোরা কোয়ার্টার। বর্ষায় ফুটো চাল দিয়ে জল পড়ছে প্রতি বছর, শীতে কনকনে বাতাস ঢুকছে। রোগে ভুগে কত মজদুর মারা গেছে। তবু কোম্পানীর মালিকরা কোনো প্রতিকার করেনি। আবেদন-নিবেদন, দরবার অজস্র বার করা হয়েছে। প্রতিবারই কোম্পানী তা নাকচ করে দিয়েছে।

এমনি অবিচারের রাজত্ব বহুদিন যাবং চলেছিল। তারপর আবির্ভাব হলো সাগিনার। সাগিনা মজদুরদের নিয়ে দল পাকাল। গোরা অফিসার, ফিরিঙ্গি অফিসারদের দাপট আর বাঙ্গালী ক্লর্ক বাবুদের শয়তানি সাগিনার দলকে দিনের পর দিন শক্ত করে তুলল।

এসব খবর শুনেছিলাম সাগিনার বিভিন্ন আড্ডায়। বিভিন্ন লোকের মুখ থেকেই। সাগিনার আড্ডাগুলোর বেশীর ভাগই ছিল মদের আড্ডা। ওগুলো যেন সাগিনার এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের রাজধানী। ওখানে বসে সাগিনার মুখ থেকে যে হুকুম বেরোবে, পৃথিবীর কারও সাধ্য ছিল না তা রদ করে। চন্দ্র সূর্য ওঠার মতোই সেগুলো তামিল হতো।

'আরে সাথী, কত বলব! ওসব সরম কি বাত আছে—শালে গোরা লোগ বহুত লাথ মেরেছে।'

বুড়ো গুরুং পুরোনো ইতিহাস শোনাত। মদে ঢুলু ঢুলু হয়ে অন্তরঙ্গভাবে জড়িয়ে ধরত আমার গলা। আদর করে গেলাসে মদ ঢেলে বলত, লে। পিয়ো। তারপর গুরুং-এর মুখ ছুটত।

'হাঁ, লাথ মারত। মর্দানাকে মারত। জেনানাকো ভি মারত। কসুর থাকলে মারত, না থাকলেও মারত। শালে লোগ দনাদ্দন দনাদ্দন জুতি চালাত। হাঁ। বহোৎ সাথী ঘায়েল হয়েছে। তো

কি করব, খালি লাথ খেয়েছি। আর শালা অফসার লোগ বিবি বেটি সব বাংলোয় লিয়ে তুলেছে। ছোট ছোট অফসার—এই নিস্‌পেক্টর, টি টি সি লোগও ঐসে হারামি। ওরাও লিয়েছে। তো কি করব, শালা লোগ গোরা আছে। রিপোর্ট করবে তো নোকরি থিকে ফৌরণ বরখাস্ত। তো কি করব। আচ্ছা বাবা, লাথ মারো, লে যাও বিবি, বেটি, বহিন। নোকরি খেয়ো না। তো কি করব। কোনো লীডার তো ছিল না। ডরকে মারে কেউ বাবা কোনো কথা বলতো না। হাঁ। গরীব আছি, মজতুর আছি, কুলি আছি। খালি লাথ মারছে। তো গোরা হতাম কি ফিরিঙ্গি, আমিও লাথ মারতাম। আর বাঙ্গালী ক্লর্কবাবু হতাম তো জেব্ ভরতাম গরীবের পাকিট মেরে। আচ্ছা বাবা মারো। কোনো সংগঠন তো ছিল না, লীডার ভি না। তো কি করব। আজ আমাকে লাথ মারছে সাহাব তো উ শালা হাসি করছে। কাল ওকে মারছে তো আমি হাসি করছি। হাঁ সচ বাত। বিলকুল সচ। তো কি করব। আমি একেলা কিছু বলব সাহাবকে তো সব শালা ভাগবে। কেউ মদত দিবে না। আমি শালাকে পাকড়াবে, সাহাব। দনাদ্দন দনাদ্দন পিটবে। নোকরি ভি ফৌরণ খতম।'

যখন ওদের এই রকম অবস্থা সেই সময় সাগিনা ওদের মধ্যে এল। এল একেবারে লীডার হয়ে। আর এসেই পিটতে শুরু করল। প্রথম দিকে মজতুরদেরই পিটেছিল।

'শালে কুত্তা কি বাচ্চে।'

এই ছিল সাগিনার প্রথম দিকের শ্লোগান। যে শালা সংগঠনে না আসবে, সাহেবদের মার মুখ বুজে খাবে, সেই শালাকে আচ্ছা করে পেটো। আর যে শালা চুকলি খাবে তাকে জানে মেরে দাও। যে শালা তার বিবি, বেটি কি বহিনকে সাহেবের ঘরে যেতে দেবে, ফ্যালো সে শালাকে পাহাড়ের ওপর থেকে।

এইভাবে ঢুকল সাগিনা। বছর দুয়েকের মধ্যে সব মজতুর

সাগিনার দলে ভিড়ে গেল। আর তারপর শুরু হলো উলটা খেল। 'হাঁ, সাথী', গুরুং গেলাস উপুড় করে মদ ঢেলে দিল গলায়। একটু দম নিলে।

তারপর বলতে শুরু করল, 'হাঁ, সাথী, বিলকুল উলটা খেল। সাহাব যদি লাথ মারবে তো আমিও মারব। তো কি করব, লীডারের হুকুম। মার শালে কো মার শালে কো। তো কি করবে সাহাব। নোকরি খাবে? হাঃ, আমার নোকরি যাবে তো সব মজদুর কাম বন্ধ করবে। তো কী করব, লীডারের হুকুম। আর চাক্কা বন্ধ হবে তো কোম্পানী ফুট। হাঃ হাঃ হাঃ। চাক্কা বন্ধ তো কোম্পানী ভি ফুট! শালা লোগ চার দফে নোকরি নিল আমার, বরখাস্ত করল, তো কি হলো? চাক্কা বন্ধ। আর কি হলো? ফিন আমাকে নোকরি দিতে হলো। আর কি হলো? শালা মারপিট একদম বন্ধ হয়ে গেল। আর এসব কারোয়াই সাগিনার। সাগিনা লীডার আছে। সর্দার।'

সঙ্গে সঙ্গে ক'জন সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে সাগিনা হৈ হৈ করে ঢুকল সেই দোকানে।

গুরুং উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগল, 'আও আও আও, সাথী, পিয়ো পিয়ো পিয়ো।'

সাগিনা তার বিরাট দেহটা আমার পাশে ভুম করে যেন আছড়ে ফেলল। আমার পিঠে মারল এক থাপ্পড়।

বলল, 'আ কামরেড। পিতা হ্যায়। হাঃ হাঃ। ইতো আব্ ঠিক সাথী বনে গিয়েছে। লেকিন এক আফসোস। কামরেডের জন্য একটা তো আওরাত চাই। মর্দানা হো, ইয়া নেহি? আচ্ছা, ফিকির নেহি। উও ভি মিলে যাবে।'

আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে এক পাহাড়ীকে ডেকে বলল, 'এ বাহাদুর, হ্যায় কোই, আচ্ছা চীজ? কামরেডের জন্য দিতে পারিস।'

বাহাদুরের ভোঁতা মুখ আমার দিকে হেসে উঠল।

বলল, 'কাম তো কিচ্ছু মুস্কিলের না আছে।'

'তো ঠিক হ্যায়', সাগিনা হুকুম দিল, 'কামরেডের লিয়ে এবার পিয়ে নিই, আও।'

আগে যা ছিল 'সাগিনার গ্যাং', এই এক বছরে আমরা তাকে মজদুর ইউনিয়নে পরিণত করেছি। অফিস হয়েছে আমাদের। আমি অফিস সেক্রেটারী। সাগিনা ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট, কাজিমন সেক্রেটারী। একটা একজিকিউটিভ কমিটিও আছে। কিন্তু কার্যত সাগিনাই সব।

অতি কষ্টে কিছুটা শৃঙ্খলা আনা গেছে। ইউনিয়নকে কোম্পানী স্বীকৃতি দিয়েছে। মারপিট কমেছে। কথায় কথায় চাকা বন্ধও হচ্ছে না। প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী আর অফিস সেক্রেটারীকে ফার্স্ট ক্লাস পাশ দিয়েছে কোম্পানী। হেডকোয়ার্টারে কোনো মিটিং হলে কোম্পানী হলটিং এলাউন্সও দিচ্ছে। সরকারীভাবে খাতির দেখাচ্ছে সাগিনাকে। সাগিনার মাইনেও বাড়াতে চেয়েছিল। সাগিনা মুখের উপর না বলে দিয়েছে।

বলেছে, আমার একার মাইনে বাড়িয়ে তো ফায়দা কিছু হবে না, সকলের মাইনে বাড়াও।

আমরা দু' মাস আগে একটা দাবী সনদ পেশ করেছি কোম্পানীর কাছে। তাতে অবিলম্বে মজুরদের জন্য নূতন কোয়ার্টার করতে বলেছি। বলেছি, পুরানো কোয়ার্টার সংস্কার করো। অবিলম্বে শতকরা ২৫ টাকা মূল বেতন ও মূল বেতনের অর্ধেক মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি, ওভারটাইম, ছুটি, বদলি, পাশ, চিকিৎসার ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি দাবীও করা হয়েছে।

কোম্পানী এই ব্যাপারে নানা অছিলায় টালবাহানা করছে। খালি চিঠিপত্র চালাচালি হচ্ছে দু'পক্ষে। আমাদের অফিসে চিঠির পাহাড় দাঁড়িয়ে গেছে।

সাগিনা তা দেখে আর আমাদের ঠাট্টা করে। সে এইসব

ব্যাপারে আদৌ বিশ্বাসী নয়।

বলে, 'বাঘঁকে যতই দুধ পিলাও খুন সে চুষবে। ও শালাদের দাওয়াই না দিলে ওরা আমাদের বাপ বলবে কেন ?'

আমি ওকে ট্রেড ইউনিয়নের মূল তত্ত্ব বোঝাতে চেষ্টা করলে সাগিনা হাঃ হাঃ করে হাসে।

বলে, 'এই তো ছ' মাহিনা কাবার হলো। আমরা খেতে চেয়েছি কোম্পানীর কাছে। লেকিন মিলল কি ? চিঠ্ঠি এইসব !'

অবজ্ঞা ভরে চিঠিপত্রের ফাইলগুলো উলটে দিলে।

বলল, 'দেখ কামরেড, এই পড়া-লিখা খেলায় কাম চলবে না। ছ' মাস ধরে খুট খুট চিঠি লিখছ, ভেজছ। ও শালারাও খুট খুট চিঠি লিখছে, ভেজছে। লেকিন ফায়দা কি হচ্ছে। তোমাদের এই নয়া তরিকায় এদের কাছ থেকে কাজ আদায় করা যাবে না। পুরানা রাস্তা ধরতে হবে। পিটতে হবে শালাদের, চাকা বন্ধ করতে হবে। তখন দেখবে, শালারা এসে বাপ বলছে। মিটিং বোলাও।'

প্রথমে একজিকিউটিভ মিটিং, পরে জেনারেল মিটিং। দুটো মিটিং-এই ঠিক হলো, একটা চরমপত্র দেওয়া হোক কোম্পানীকে। এক মাসের মধ্যে আমাদের দাবীগুলো যদি না মিটায় তো চরম পন্থা গ্রহণ করা হবে।

আমরা যেদিন চরমপত্র পাঠালাম সেদিন কি উল্লাস সকলের মধ্যে। ভাটিখানাটা ভরে গেল সাগিনার সাঙ্গোপাঙ্গোয়। অনেক রাত পর্যন্ত মদ খাওয়া চলল। হৈ হুল্লোড়। ফুর্তি।

হঠাৎ সাগিনা আমাকে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল। আমি ইউনিয়নের অফিস হওয়া ইস্তক সেখানেই থাকতাম।

সাগিনা বলল, 'দেখ কামরেড, যার ঘরে খানাপিনার দানাপানি আছে তারা দেরী করতে পারে, ধৈর্যও ধরতে পারে। কিন্তু ভুখা নাঙ্গা মজদুর ধৈর্য পাবে কোথায়। খেতে দাও, পরতে দাও, কাজ নাও। গোলমাল কেউ করবে না। কিন্তু দানাপানি দেবে না,

খালি বাত, খালি ওয়াদা, ওতে কাম চলে না। এবার আখেরি লড়াই হবে। পিছু ফায়সালা। দোসরা রাস্তা আর নেই।'

বলতে বলতে অফিসে এলাম। দুটো ঘর। একটা অফিস, আর একটা আমার শোবার ঘর। দেখি শোবার ঘরে আলো জ্বলছে।

সাগিনা আমাকে নিয়ে সেই ঘরে ঢুকেই বললে, 'লো, ক্যায়া পছন্দ আসছে?'

উনিশ-কুড়ি বছরের একটা মেয়েকে নিয়ে দেখি বাহাদুর আমার বিছানায় বসে আছে। মেয়েটি বেশ দেখতে। অনেকটা ললিতার মতো। মিচকি মিচকি আমার দিকে চেয়ে হাসছে। দেখেই আমার নেশা কেটে গেল? বুক ধড়ফড় করতে লাগল। কান মুখ গরম হয়ে উঠল।

বাহাদুর চোখ টিপে বললে, 'আচ্ছা হ্যায়।'

আমার হতভম্ব ভাব দেখে সাগিনা আর বাহাদুর হাঃ হাঃ করে হেসে ঘর যেন ফাটিয়ে ফেলতে লাগল। সে হাসির ছোঁয়াচ মেয়েটিরও লাগল। রিণরিণে গলায় হাসতে হাসতে সে যেন ঘরময় গান ছড়িয়ে দিতে লাগল।

মুহূর্তে সংবিৎ ফিরে পেলাম। আমার গায়ে এক বছরে সর্বহারার যে পালিশটা পড়েছিল তা ভেতরকার সেই পাতি বুর্জোয়া ভূতটার গুঁতোয় ছিঁড়ে খান খান হয়ে গেল। ভালো করে কিছু বোঝবার আগেই দেখি রাস্তা ধরে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করেছি। একবার মনে হলো পিছনে সাগিনা আর বাহাদুর হাঃ হাঃ করে হাসতে হাসতে তাড়া করেছে। মনে হলো সেই মেয়েটির রিণরিণে হাসির সঙ্গীতও যেন আমাকে তাড়া করেছে। কামরেড, কামরেড— কারা যেন চেঁচিয়ে ডাকলও কয়েকবার।

সেই যে ছুটেছিলাম আর থামলাম এসে মহানন্দার ব্রিজের উপর। রেলিং ধরে হাঁফাতে লাগলাম। ঠাণ্ডা বাতাস চোখ মুখ কানকে অনেকটা আরাম দিল। দূরে জমাট-বাঁধা অন্ধকারের এক

উত্তুঙ্গ পিণ্ড। হিমালয়। সামনেও ঘন অন্ধকার। শুকনার ফরেস্ট। নিচে মহানন্দার রূপালী রেখা। উপরে তারাভরা আকাশ। আর অজস্র জোনাকি। ঝিঁঝির অফুরান সঙ্গীত। তার মধ্যে পাহাড়ী মেয়ের সেই সুন্দর সরল মুখখানি বার বার আমার চোখে ফুটে উঠতে লাগল।

হঠাৎ আমার মনে হলো, তাই তো, আমি এমনভাবে পালিয়ে এলাম কেন? মেয়েটার মুখ, তার সেই মিঠে হাসি আমাকে টানতে লাগল। সেই টানে ঘরের দিকে আবার যখন পা বাড়ালাম, তখন রাত শেষ হতে আর বাকী বিশেষ নেই। ঘরের দরজায় এসেও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। বুক যেন ফেটে যাবে, ধকধক এমন উত্তেজনা। তারপর সাহস করে, আলতো ভাবে দরজা খুলে দেখি ভেতরে কেউ নেই। হতাশা যেন বুকের মধ্যে কট করে কামড় বসাল ইঁদুরের মতো। আমি বোকা, আমি ভীতু, আমি পাতি বুর্জোয়া।

মনে পড়ল, আরেকবার এই রকম ব্যবহার করেছিলাম বলে সাগিনা আমাকে ধমকেছিল। বলেছিল, তুমাকে দিয়ে কুচ্ছু হবে না। তুমি আওরাত দেখেই ভাগো, কোম্পানীর জাঁদরেল সাহেবদের মহড়া কি করে নেবে!

পরদিন বিকালেই খার্সাং থেকে কাজিমন এসে হাজির। আমাদের পার্টির ঐ অঞ্চলের হেড কোয়ার্টার তখন খার্সাং-এ। কাজিমন স্থানীয় শাখার কর্তা।

কাজিমন বললে, 'একটু পরেই কলকাতার মেল, আর দেরী নয়, চটপট তৈরি হয়ে নাও, কলকাতায় যেতে হবে, জরুরী তলব।'

কাজিমনকে নিয়ে তক্ষুনি সাগিনার খোঁজে বের হলাম। সেই ভাটিখানায় গিয়ে দেখি তুমুল উত্তেজনা।

খার্সাং-এর ইউনিট সেক্রেটারী ওয়াংদি এসে গেছে। সে উত্তেজিতভাবে কি বলছে আর মন দিয়ে শুনছে সাগিনা।

ওয়াংদির কথা বুঝলাম, ঘটনা এবার পাকিয়ে উঠল। বার্ন বলে একটা বদমায়েশ অফিসারের বিরুদ্ধে আমরা অনেকদিন থেকে নালিশ পাচ্ছিলাম। ব্যাটা ক্যারেজ শপের এ্যাসিস্ট্যান্ট ফোরম্যান। ঘুষ নেয়, মজুরদের যত রকমে পারে জ্বালায়, মেয়েদেরকে উৎপাত করে। ওর বিরুদ্ধে আমাদের ইউনিয়নের পক্ষ থেকে নালিশ গেছে কোম্পানীর কাছে। কোনো সুরাহা হয়নি। বদলি করার দাবী তুলেছি আমরা, পুনঃ পুনঃ বলেছি, লোকটার জন্যে হয়তো অশান্তি ঘনিয়ে উঠতে পারে। 'কোনো ভ্রূক্ষেপ করেনি কোম্পানী! তাই লোকটার স্পর্ধাও দিন দিন বেড়ে উঠেছে।

কাল রাতে নামগিল বলে একটা মজুরের নাইট ডিউটির সুযোগ নিয়ে বার্ন তার ঘরে ঢুকেছিল। নামগিল জানতে পেরে বাসায় ফিরে আসে। তারপর বৌয়ের বিছানায় সাহেবকে উলঙ্গ হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে বেদম ধোলাই দিয়েছে। প্রাণটা কোনোমতে আছে তার। তবে হাড়গোড় ভেঙ্গে একেবারে 'দ' হয়ে গেছে বার্ন সাহেব।

ওয়াংদি বললে, 'উসকে বাদ পুলিশ আয়া। নামগিল কো পাকাড় লিয়া, ফাটকমে ডালা। আব হামিলোগ কেয়া করে?'

'হরতাল করো। কাম বন্ধ করো। আউর কেয়া করেগা?'

সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। সাগিনাও।

বলল, 'কাম বন্ধ করো! পিছু দেখা যায়েগা।'

কাজিমন বললে, 'কাজটা একটু বে-আইনি হচ্ছে সাগিনা। আমার মনে হয়, জেনারেল ম্যানেজারের কাছে ব্যাপারটা জানিয়ে তার ভেজে দিই। বলে দিই, তদন্ত সাপেক্ষ নামগিলের উপর থেকে কেস উঠিয়ে নেওয়া হোক। ওকে এখন খালাস দেওয়া হোক।'

সাগিনা কাজিমনকে ধমকে উঠল।

বললে, 'রাখ সাথী, তুমি আদমি আচ্ছা আছ, পড়িলিখি ভি আছ, লেকিন বেওকুফ। জানরল মানজার কা পাস হামলোগকো যানে হোগা, কিঁউ? কি কসুর আমাদের! এক জানোয়ার

আমার ঘরের ইজ্জৎ নষ্ট করেছে, আমি তাকে পিটেছি। কসুরটা কোথায়? তোমার শালা পুলিশ আছে, তুমি আমাকে পাকড়ালে। আখুন আমাদেরও কিছু তাকত দেখাতে হবে। কাল কাম বন্ধ হবে তো জানরল মানজর নিজে আমাদের বাপও বলবে, ফায়সালাও করবে।'

কাজিমন সাগিনাকে অনেকভাবে বোঝালে। বললে, গায়ের জোরের দিন আজ আর নেই কামরেড। হয়তো একটা দুটো লড়াই এভাবে জিততেও পার। কিন্তু আখেরি মামলা এভাবে জেতা যাবে না। তোমাকে ট্রেড ইউনিয়নের রীতিনীতি মেনেই লড়াই জিততে হবে।

সাগিনা বিদ্রূপ করল কাজিমনকে।

'ইয়ার, লড়াই কাগজ-কালিতে হয় না। হাতিয়ার লাগে। ছ' মাহিনা ধরে তোমার কাগজ-কালির লড়াই দেখেছি। তার নতিজাও দেখেছি। আখুন তুমি আমার হাতিয়ারের লড়াই দেখো। আর তার নতিজাও দেখো।'

সাগিনা তারপর টেবিল চাপড়ে বললে, 'সাথীও, পেট ঔর ইজ্জৎ যে শালা কাটবে, তাকেও কাটতে হবে। কাল কারেজ ডিপার্টকে কাম বন্ধ থাকবে। ফায়সালা যদি তাতেও না হয় পরশু থেকে পুরা লাইন বন্ধ হয়ে যাবে।'

সাগিনার কথা শুনে সবাই উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল। চকচক করে জ্বলে উঠল ওদের চোখ।

কাজিমন আর আমি বেরিয়ে এলাম। কাজিমন কিছুক্ষণ কথা বলল না। মুখ বুঁজে হাঁটতে লাগল।

তারপর বলল, 'এ অবস্থায় এখান থেকে কোথাও যাওয়া ঠিক হবে না। চল, কলকাতায় তার করে দিই।'

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা খুবই ঘোরাল হয়ে উঠল। গোটা লাইনেই

ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ল।

তখন পুরো যুদ্ধের সময়। শৈলাবাস গোরা সৈন্যদের ছুটি কাটাবার একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। কোম্পানী প্রথমদিকে তারই সুযোগ নেবার চেষ্টা করল। সাগিনা-সমস্যার চির সমাধান করবার জন্য দমন নীতির আশ্রয় নিল। ইউনিয়ন বে-আইনী ঘোষিত হলো। আমাদের নামে হুলিয়া বেরুল। সাগিনা আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে তার অনুচরদের নিয়ে গা ঢাকা দিল।

কিন্তু আশ্চর্য তার সংগঠনী প্রতিভা। আড়াল থেকে সে ধর্মঘট চালাতে লাগল। একটি মজদুরও কাজে যোগ দিলে না। কোম্পানী একখানি গাড়ীও চালাতে পারল না।

এই ব্যাপার নিয়ে আমাদের পার্টির উচ্চমহলে ঘন ঘন বৈঠক বসল। সাগিনার এই আকস্মিক ধর্মঘট আমাদের পার্টিকে একটু অসুবিধায় ফেলেছিল। আমাদের শাসকবর্গ ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ায় আমরা তাদের সমর্থন করার নীতি নিয়েছিলাম। শ্রমিক আন্দোলনকেও আমরা সেই পথে পরিচালিত করছিলাম। গভর্নমেণ্টকে চাপ দিচ্ছিলাম একটা প্রগতিশীল শ্রমিক নীতি গ্রহণ করার জন্য।

ঠিক সেই মুহূর্তে সাগিনা এই গণ্ডগোলটা পাকিয়ে তুললে। যদিও সাগিনা আমাদের পার্টি মেম্বার ছিল না, পার্টি-ফার্টি ও বুঝত না, বুঝতে চাইতও না, তবু কার্যত ওর ইউনিয়নকে আমরা আমাদের ইউনিয়ন বলেই চালাতাম।

সাগিনার এই কাজের জন্য পার্টি আমার আর কাজিমনের কাছে কৈফিয়ত তলব করল। আমরা এ ব্যাপারটা ঘটতে দিয়েছি বলে গালাগাল খেলাম নেতাদের কাছ থেকে। জবাব আর কি দেব। আমি তবুও বলেছিলাম, এই বিশৃঙ্খলার জন্য প্রধানত কোম্পানীই দায়ী। ছ' মাস কঠোর পরিশ্রম করে আমি আর কাজিমন একটা সুস্থ ট্রেড ইউনিয়নের পরিবেশ গড়ে তুলেছিলাম। কিন্তু কোম্পানী

সেটা বজায় রাখার কোনো চেষ্টা করেনি। যে অমানুষিক দুর্দশার মধ্যে ওখানকার মজদুররা দিন কাটায় সে অবস্থার উন্নতি না হলে এ রকম বিশৃঙ্খলা আসা স্বাভাবিক। মজদুররা খেতে চায়, তাদের খাবার সংস্থান করতে হবে। ভুখা মজদুর ধৈর্য পাবে কোথায় ?

বুঝতে পারলাম, সাগিনার কথাই আবৃত্তি করে চলেছি। এও বুঝলাম নেতারা আদৌ সন্তুষ্ট হলেন না। দুনিয়ার মজদুরের স্বাধীনতা যেখানে ফ্যাসিস্ট হামলায় বিপন্ন সেখানে সাগিনার অনুচররা খাচ্ছে কি না-খাচ্ছে সেটা তাঁদের চোখে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারই নয়। আমরা আদর্শ নিয়ে লড়ছি। আর সাগিনারা সেখানে খিদে, ইজ্জৎ এই সমস্ত স্থূল ব্যাপারে বড্ড বেশী মাথা ঘামাচ্ছে। নেতারা ক্রুদ্ধ হতেই পারেন।

আমাদের পার্টির গোপন মিটিং-এ ঠিক হলো, ঐ ইউনিয়নের উপর পার্টির কর্তৃত্ব স্থাপন করতে হবে। তা না হলে পার্টির পলিসি অনুসারে ওটাকে চালানো যাবে না। সিদ্ধান্তটা আমাকে যখন শোনানো হলো, আমি মনে মনে হাসলাম। সাগিনা ছাড়া ওখানে আর কাউকে দাঁত ফোটাতে হবে না।

কিন্তু পার্টি সত্যিই অসাধ্য সাধন করল। কোম্পানী যখন শত চেষ্টাতেও গাড়ী চালাতে পারলে না তখন আমাদের পার্টির শরণ নিল। পার্টি আর কোম্পানীর উচ্চ মহলে ঘন ঘন বৈঠক বসল। চুক্তিনামা তৈরী হলো। পার্টির পরামর্শে কোম্পানী সব মামলা তুলে নিল। ইউনিয়নকে আবার স্বীকৃতি দিল।

তবে তার চেয়েও তাজ্জব ব্যাপার, বড় মাইনের একজন লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসারের পদ সৃষ্টি হলো। আর এই প্রথম কোনো সাহেব নয়, কোনো বাবু নয়, মজদুরদের আস্থাভাজন একজন সত্যিকারের মজদুরকে সেই পদে বসাতে কোম্পানী স্বীকৃত হলো। মজদুরদের জয়জয়কার পড়ে গেল।

আমার বুক ফুলে উঠল জয়ের আনন্দে। সমস্ত শ্রদ্ধা লুটিয়ে

পড়ল ব্যারিস্টার কমরেড বিজন দত্তের পায়ে। তিনিই এই চুক্তি-নামার খসড়া তৈরি করেছেন।

শ্রমিকদের যা কিছু কল্যাণ তা কোম্পানীকে করতে হবে লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসারের পরামর্শ মতো। মজদুররা ভোট দিয়ে যাকে পাঠাবে সেই পাবে এই পদ। কোম্পানীর কোনো কারচুপি এতে চলবে না।

বস্তিবাজারের ময়দানে মজদুরদের বিরাট সম্মেলন হয়েছিল। আমার চোখে সেদিনটি উজ্জ্বল হয়ে আছে। কমরেড দত্ত ছিলেন এই সম্মেলনের সভাপতি। তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর বোন কমরেড বিশাখা দত্ত। আমাদের পার্টিতে এমন সুন্দরী কমরেড আর দ্বিতীয় ছিল না। মঞ্চ আলো করে তিনি বসেছিলেন। আর তার পাশে ছিল সাগিনা। বিজয়ী বীরের মতো মাথা উঁচু করে বসেছিল সে। আর তার দিকে ঝুঁকে বিশাখা সারাক্ষণ ফিসফিস করে কথা বলছিলেন। সাগিনার স্ফূর্তি যেন উথলে পড়ছিল।

কমরেড দত্ত সভাপতির ভাষণ দিলেন দেড়ঘণ্টা ধরে। মজদুরদের অনমনীয় দৃঢ়তার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। বার বার সাগিনার নেতৃত্ব, ব্যক্তিত্ব, তাঁর কৌশল, তাঁর স্বার্থত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। উল্লাসে, হাততালিতে মজদুরেরা মণ্ডপ ফাটিয়ে দিতে লাগল। "কমরেড সাগিনা জিন্দাবাদ।" "কমরেড সাগিনা কি জয়।" শুনতে শুনতে কানে তালা লেগে গেল আমাদের।

কমরেড দত্ত বললেন, 'এ জয় শুধু সাগিনার একার জয় নয়। এটা মজদুরদের সংঘ-শক্তিরই জয়। এই রেলের মজদুর তার সংগঠন শক্তির জোরে যা মালিকদের কাছ থেকে আদায় করেছে ভারতের কোনো জায়গার মজদুরই তা পারেনি। লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার আর কোথায় এমন মজদুরদের ভোটে নির্বাচিত হয়েছে? আর কোথায় একজন সাচ্চা মজদুরকে সেই পদে বসানো হয়েছে? কমরেডস, সেই পদের জন্য এইবার আপনারা একজন আপনার

লোক ঠিক করুন।'

কমরেড দত্ত বসতে না বসতে সব হৈ চৈ মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল। সূঁচ পড়লে শোনা যায় এমন স্তব্ধতা নেমে এল। মনে হলো কথাটা কেউ যেন ধরতে পারেনি। অমনি বিশাখা মঞ্চের উপর উঠে দাঁড়ালেন। একটা জ্বলন্ত আলো যেন ঠিকরে পড়ল।

তাঁর মিহি সঙ্গীতময় কণ্ঠ থেকে স্বর বেরুল, 'সাগিনা। কমরেড সাগিনাই আমার মতে এই পদের সব থেকে যোগ্য।'

'সাগিনা। হ্যাঁ হ্যাঁ সাগিনা।'

সেই উত্তাল কলরোলে আবার বার বার ধ্বনিত হলো "কমরেড সাগিনা কি জয়।"

কমরেড বিশাখা দত্ত টেবিলের উপর থেকে এক বিরাট মালা তুলে সাগিনার গলায় পরিয়ে দিলেন। হুড়মুড় করে বাহাদুর, ওয়াংদি, নামগিল, গুরুং আরও যেন কারা কারা মঞ্চের উপর উঠে গেল। সাগিনাকে নামিয়ে এনে কাঁধে তুলে নাচতে লাগল।

সারাদিন হুল্লোড় চলল। সন্ধ্যের দিকে কমরেড বিজন দত্ত আর বিশাখা খার্সাং চলে গেলেন। যাবার আগে সাগিনা আর আমাকে বলে গেলেন, পরদিন সকালেই যেন সেখানে চলে যাই। কাজিমন ওঁদের সঙ্গেই গেল।

খার্সাং-এ আমরা কমরেড দত্তদের বাড়ীতেই উঠলাম। বিশাখা সাগিনাকে খুব খাতির করেই ভিতরে নিয়ে গেলেন। দুপুরে কাজিমনও এল। খাবার নেমন্তন্ন করেছিলেন দত্তরা।

খাবার টেবিলে কাজের কথা উঠল। কমরেড দত্ত সাগিনাকে তার পদের গুরুত্বের কথা বোঝাতে লাগলেন। খুব দায়িত্বপূর্ণ কাজ এটা। মজদুরদের তাবৎ মঙ্গল, কল্যাণ এখন সাগিনার হাতে। সাগিনা বিরাট কোয়ার্টার পাবে। সাহেবদের মতো কোয়ার্টার। মজদুররা সাহেবদের তুলনায় কোনো অংশেই যে ছোট নয়, সেটা যেন সাগিনা একবার কোম্পানীকে বুঝিয়ে দেয়। সাগিনাকে একটি

অফিসও চালাতে হবে। তবে তার জন্য সাগিনা যেন না ঘাবড়ায়, কমরেড দত্ত কলকাতা থেকে একটা ভাল সেক্রেটারী পাঠিয়ে দেবেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর দেখি সাগিনা খুব গম্ভীর হয়ে গেছে। ভাবছে খুব। আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বিশেষ বলল না।

জেনারেল ম্যানেজারের বেয়ারা এসে কমরেড দত্তকে একটা চিঠি দিল। চিঠিখানা পড়ে তিনি সাগিনাকে ডাকলেন।

বললেন, 'কমরেড, কাল বিকালে বড় সাহেবের কাছে যেতে হবে। তোমার এপয়েণ্টমেণ্ট হবে।'

সাগিনা অন্যমনস্কভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'আচ্ছি বাত।'

কমরেড বিশাখা সেজেগুজে বেরোলেন তাঁর ঘর থেকে।

জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের কাজ চুকেছে? আমি একবার শৈলাবাসে যাব।'

কমরেড দত্ত বললেন, 'যাও।'

কমরেড বিশাখা অমনি সাগিনাকে বললেন, 'কমরেড, যাবে আমার সঙ্গে?'

দেখলাম সাগিনার মুখটা এতক্ষণে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

হেসে বলল, 'জরুর।'

রাত প্রায় ন'টা নাগাদ সাগিনারা ফিরে এল। আমি দেখে তো অবাক। সাগিনাকে সত্যিই চিনতে পারিনি। পরিষ্কার স্যুট পরেছে। টাই বেঁধেছে। নতুন জুতো দিয়েছে পায়ে। ওকে যে এত ভাল দেখতে তা এই এক বছরে কখনো তো টের পাইনি। কমরেড বিশাখার এক নতুন সৃষ্টি বলেই সাগিনাকে মনে হলো। দেখলাম দুপুরের সেই গুমোট ভাবটা কেটেছে সাগিনার। একটা নতুন ফূর্তির উদয় হয়েছে ওর মনে। চোখ-মুখ টল টল করছে।

বিশাখা বললে, 'ছাখ দাদা, আমাদের বীর কমরেড সাগিনাকে এইগুলো আমি প্রেজেণ্ট করেছি। কাল যেন সাহেবের সামনে সমানভাবে দাঁড়াতে পারি।'

কমরেড দত্তও অবাক হয়েছিলেন একটু, কিন্তু তিনিও খুব খুশি হলেন সাগিনার এই পরিবর্তনে।

বললেন, 'সত্যিই কমরেডকে ভাল মানিয়েছে।'

বিশাখা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, সাগিনার অনভ্যস্ত টাইটা একটু টেনে ঠিক করে দিলেন।

খুশি হয়ে বললেন, 'একেবারে নতুন মানুষ। তাই না!'

হাঃ হাঃ হাঃ করে এই নতুন সাগিনা সেই পুরনো হাসি ছাড়ল। সেই তার ঘর-কাঁপানো হাসি।

সাগিনা লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার হবার পর দু'মাস আমি শিলিগুড়িতে ছিলাম। প্রথমদিকে ঘন ঘন শিলিগুড়ি আসত সে। সঙ্গে আনত কমরেড বিশাখাকে। বিশাখা তারপর থেকে কিছুদিন খার্সাং-এই থেকে গিয়েছিলেন। এতে সাগিনার লাভ হয়েছিল। উনিই তার সেক্রেটারীর কাজ করে দিতেন। বোধকরি সহবতও শেখাতেন। তারপর শিলিগুড়ি আসা তার কমতে লাগল। কাজ হয়তো বেড়ে যাচ্ছিল।

আমাকে হঠাৎ শিলিগুড়ি থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো লাল-মণিরহাটে। আমি আসবার আগেই মজদুরদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার উপর ভিত্তি করে এক স্মারকলিপি সাগিনার অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সাগিনা সেই দাবীগুলো উশুল করবে বলে জানিয়েছিল।

তবে ভালভাবে কোনো কাজে মন দেবার আগেই সাগিনার ডাক পড়ল বিভিন্ন জায়গা থেকে। মুখে মুখে সর্বত্রই সাগিনার নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। নানা কাহিনীও প্রচারিত হয়েছিল। আজ মাদ্রাজ, কাল গুজরাট, পরশু বিহার—এমনি করে তাকে ঘোরানো হচ্ছিল। কানপুর, ঝরিয়া, টাটানগর, আমেদাবাদে ঘটা করে সংবর্ধনা জানানো হলো ওকে। শুনেছি প্রায় প্রত্যেকটি জায়গাতেই বিশাখা ওর সঙ্গে ছিলেন। আমাদের নিখিল ভারত

মজতুর ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত করা হলো সাগিনাকে।

দেড়টি বছর সাগিনা শিলিগুড়ি-ছাড়া।

আর এই দেড় বছরের মধ্যে শিলিগুড়ির ইউনিয়নে দলাদলি শুরু হয়ে গেল। কাজিমনের কাছ থেকে মাঝে মাঝে চিঠিপত্র পেতাম। কাজিমন বড় বিব্রত বোধ করছিল। সবাই জানত ওয়েলফেয়ার অফিসার আমাদের লোক। মজতুরদের অভিযোগ পুঞ্জীভূত জমে উঠেছিল। কোম্পানীকে কিছু বলার উপায় নেই। সে সাগিনার অফিস দেখিয়ে দেয়। কিন্তু কোথায় সাগিনা?

কাজিমন পার্টি অফিসে এ সম্পর্কে লিখে লিখে হদ্দ হয়ে গেল। পার্টি অফিস থেকে জবাব আসে, কমরেড সাগিনাকে পার্টিরই বৃহত্তর স্বার্থে নিয়োগ করা হয়েছে। সে সারা ভারতের মজতুরকে সংগঠন করেছে।

শেষে এক ইউনিয়ন তিন ইউনিয়ন হয়ে গেল। তার একটা ইউনিয়ন অবশ্য কাজিমনের দখলে থাকল। আর সেটা পুরোপুরি আমাদের পার্টিরই লেবার ফ্রণ্ট হয়ে দাঁড়াল। আর তুটো অংশ অন্য তুটি পার্টির কবলে চলে গেল।

সাগিনার নামে নানা বদনাম বেরুতে লাগল। গুরুং, দলবাহাতুর, ওয়াংদিরা পর্যন্ত সাগিনার শত্রু হয়ে উঠল।

এদিকে ইউনিয়নে ইউনিয়নে বেশ মারামারি দাঙ্গা চলতে লাগল।

অবস্থা ওখানে যখন এমনি চরম, তখন পার্টি আমাকে নির্দেশ দিলে, শিলিগুড়ি যাও। কাজিমন পার্টি ছেড়ে দিয়েছে। ইউনিয়নে ফিফ্‌থ কলাম ঢুকেছে। ধর্মঘট করাতে চায়। সেটি প্রতিরোধ করতে হবে!

শিলিগুড়ি ফিরে এসে ব্যাপার দেখে আমার তো চক্ষুস্থির। অফিস উঠে গেছে। আমাদের সমর্থক বলতে কেউই প্রায় নেই। খার্সাং গেলাম। দেখি কাজিমন ভেঙ্গে পড়েছে।

কাজিমন বলল, 'এখানকার কাম খতম। বিলকুল খতম। সব টুকরো টুকরো হয়ে গেছে ভাই। জোড়া দিবে কি দিয়ে ?'

বললাম, 'কেন, সাগিনা আছে। তাকে আনব। পারলে সে-ই পারবে।'

কাজিমন হতাশ হয়ে বলল, 'একদিন সে পারত। আজ সেও পারবে না। আমরা তাকে খতম করে দিয়েছি।'

কাজিমনের কথা বুঝতে পারলাম না। আমরা খতম করেছি মানে কি ?

মানে কাজিমন নিজেই বলল।

'দেড় বছর আগে শিলিগুড়িতে যে সম্মেলন হয়, সেইখানেই খতম করেছি সাগিনাকে। কমরেড, তখন আমার একটা খটকা লেগেছিল। কোম্পানী এত সহজে এ-রকম একটা দাবী মেনে নিচ্ছে, ব্যাপার কি ? তারপর ভাবলাম, যুদ্ধের সময় আছে। সরকার হয়তো চাপ দিয়েছে তাই কোম্পানী মেনেছে এই দাবী। কিন্তু ক'মাস পরেই আমার ভুল ভাঙ্গল। তুমিও এখান থেকে চলে গেলে আর পার্টি আমাকে চাপ দিতে লাগল ইউনিয়নকে পার্টির উইং করে ফেল। ইউনিয়নের মেম্বারদের পার্টি মেম্বার কর। ওখানে পার্টির শক্ত ঘাটি চাই—যত বলি—ইউনিয়নকে পার্টি করা যাবে না, ভেঙ্গে যাবে ইউনিয়ন—মজদুরের সংহতিতে ফাট ধরবে—মজদুরের তাকত দুবলা হয়ে পড়বে—কিন্তু কে শোনে ! একদিন কলকাতা থেকে তলব এল। গেলাম। কমরেড দত্ত কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলেন, সাগিনার প্রভাব কমেছে না বেড়েছে ! আমি তাঁর কথা ধরতে পারিনি। সরলভাবে বললাম, সাগিনাকে শিলিগুড়ি থেকে এতদিন বাইরে রাখা ঠিক হয়নি। সাগিনার বিরুদ্ধে নানা প্রচার চলেছে। তার ফলে প্রভাব তো কমবেই।'

কাজিমন বলল, 'কমরেড দত্ত কি বললেন জানো ?'

আমার পাল্টা প্রশ্ন শোনবার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল

কাজিমন।

তারপর বলল, 'কমরেড দত্ত বললেন, সাগিনা নয়, ওখানে থাকবে পার্টি। সেইটেই গড়ে তুলুন।'

কাজিমন আবার চুপ করল।

তারপর আপন মনে বলল, 'জেলে পাঠিয়ে যা না করা যেত, সাগিনাকে হিরো বানিয়ে তা করা গেল। কিন্তু ফায়দাটা হলো কি?'

কাজিমন আমার বন্ধু। খুব সত্যনিষ্ঠ কর্মী। কিন্তু সত্যি বলছি, সেদিন ওর কথা আমি বিশ্বাস করিনি। এ কি হতে পারে?

পাঁচদিন ধরে শিলিগুড়িতে ঘুরলাম। পুরনো বন্ধুরা সব জড় হলো সেই ভাটিখানায়, শুধু সাগিনা নেই। খবর পেয়েছি সে এখন বোম্বাইতে। তাকে আন্তর্জাতিক শ্রম সমাবেশে পাঠানো হয়েছে।

গুরুংকে বললাম, 'সাথী, সবাই একাঠ্ঠা না হয়ে ধর্মঘট করলে তো মরবে। তোমাদের ইউনিয়ন তো ভাঙ্গা। লীডার কই?'

গুরুং মদ খেয়ে টং হয়ে ছিল।

বলল, 'তো কি করব? লীডার শালা তো ছিল, তো শালা দালাল বনে গেল। শালা সাহেব হয়ে গিয়েছে। বড় মকানে থাকে। বিবি নিয়ে রংবাজী করে। তো কি করব। ভুখা মরব। জরুর চাক্কা বন্ধ হবে।'

'হাঁ হাঁ, হবে হবে।'

মাতালগুলো হিংস্র আক্রোশে চীৎকা[redacted]তে লাগল।

পরদিন সকালে স্টেশনে গিয়েছি। [redacted] সাগিনা। পুরোদস্তুর সাহেব।

আমাকে দেখে ডাকল, 'আরে কামরেড, তুম? তুমি কোথা থেকে?'

বললাম, 'লালমণিরহাট থাকি। এখানে এসেছি দিন দশ-বারো।'

রেস্টুরেণ্ট ঘরে নিয়ে গেল আমাকে। সাগিনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'খবর কি, কমরেড ?'

ওকে এমন সময় এখানে দেখব আশা করিনি। মনে হলো যেন বিধি-প্রেরিত।

সাগিনা বলল, সে পালিয়ে এসেছে বোম্বাই থেকে।

বলল, 'ভাল লাগে না। কি মিটিন-ফিটিন। ফালতু ঝামেলা। এত বাত করে কি কাম হবে ? আরে সংগঠন বানাও। আপনা হাতমে পাওয়ার লে লো। তব্ শালা মালিক মজদুরকো বাপ বলবে। হ্যাঁ ?'

'তারপর', সাগিনা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কি কাম এখানে ?'

বললাম, 'তোমাদের রেলে স্ট্রাইক হবে, জান না ?'

'স্ট্রাইক হবে !' সাগিনা বিস্মিত হলো। 'কবে ?'

'আজ বিকালে তো বস্তিবাজারে মিটিং আছে। ঠিক হবে।'

'আচ্ছা ?' অবাক হয়ে গেল সাগিনা।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন, তুমি জান না কিছু ?'

সাগিনা কি যেন ভাবছে।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি জান না ?'

এবার সে বলল, 'এখানে কি থাকি যে জানব। ঘুরতে ঘুরতে সত্যনাশ হয়ে গেছে। তবে কারোয়াই ঠিক হচ্ছে। চাক্কা বন্ধ আর একবার হওয়া দরকার। শালা কোম্পানী এক নম্বর [illegible]বাজ আছে। দেড় সাল [illegible] হয়ে [illegible] গেল শালার সিমিণ্ট মিলছে না। কোয়ার্টার [illegible] কণ্টাক্টর মিলছে না। খালি ঘুরাচ্ছে। [illegible] জিজ্ঞা[illegible] শালা ঝুট।'

সাগিনা ঝুঁকে পড়ল আমার সামনে।

বলল, 'দেখো কামরেড, আমার মালুম হচ্ছে কি, এইসব ওয়েলফেয়ার উয়েলফেয়ার এসব বিলকুল ধোঁকাবাজী আছে। আমাকে দিয়ে এ কাম আর চলবে না সাথী। আরে আমি ভাল

কোয়োর্টারে থাকব তো তামাম মজুরদের ভালাই হবে ? ধুর। সব গলত বাত। আমার মতুন কোয়ার্টার সব কো দো, আচ্ছা খানা দো। পুরা কাম লো। কোই শালা হুজ্জৎ করবে না। আমি খাটতে খাটতে খুন পসিনা ঢেলে দিব আর উসকে বদলা তুমি শালা দিবে শুখা বাত আর ঝুঠা ওয়াদা। ইসব তো জিন্দগী ভর চলে না। ঠিক হ্যায়, চাক্কা বন্ধ করনা ঠিক হ্যায়। লেকিন করবে কে ?'

সাগিনাকে বোঝালাম তখন অবস্থাটা। বিশদ বিবরণ দিলাম। বললাম, ইউনিয়ন নেই। নিজেদের মধ্যে মারামারি। এই অবস্থায় পাগলের মতো ওরা স্ট্রাইক করতে যাচ্ছে। সব খবর ওকে দিলাম। শুধু বললাম না কাজিমন যা বলেছিল, আর বললাম না গুরুংরা ওর সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে।

সব শুনে সাগিনা বলল, 'তবে তো আখুন চাক্কা বন্ধ চলবে না। আগে সংগঠন পাক্কা করতে হবে। ঠিক হ্যায়, কামরেড তুম ফিন হিঁয়া আ যাও। ঐসি ইউনিয়ন ফিন বানাতে হবে। আমিও আসব। এ শালার নোকরী হাম সে নেই চলেগা।'

শুনে খুব ভাল লাগল আমার।

বললাম, 'তবে চল, বস্তিবাজারে যাই, সেখানে মিটিং আছে। তুমি বলবে চল। তোমাকে পেলে আবার সব ঠিক হবে।'

'হাঁ হাঁ।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার সে কমরেড কোথায় গেল ?'

'কৌন ?'

বললাম, 'কমরেড বিশাখা।'

হাঃ হঃ হাঃ করে হেসে সাগিনা বলল, 'আরে উও তো আউর জেন্টিলম্যান আছে। মজদুরের সাথে আর কতদিন থাকবে। উও ভি ছুট গিয়েছে। যেতে দাও। জিন্দগি থাকবে তো আউর ভি আওরাত মিলবে।'

কিন্তু সেইদিনই যে সাগিনার জীবন যাবে বুঝতে পারিনি।

বস্তিবাজারের সভায় গিয়ে বুঝলাম, কাজিমনের কথা কত সত্যি।

সাগিনা আমাকে বলেছিল, সে ঠিক সময়ে হাজির থাকবে মিটিং-এ। কিন্তু আমি সন্ধ্যের মুখোমুখি মিটিংএ গিয়ে যখন হাজির হলাম, তখনো সাগিনা সেখানে যায়নি। আমার মনে নতুন আশা জন্ম নিচ্ছিল। সাগিনা বুঝতে পেরেছে যখন, তার ভেঙ্গেছে যখন, তখন আর ভয় নেই। সাগিনার ব্যক্তিত্ব বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটাবে। এই টুটা-ফুটা সংগঠনকে আবার জোড়াতালি দিয়ে দাঁড় করাবে।

জানি, আমার এ মনোভাব পার্টি বরদাস্ত করবে না। কিন্তু পার্টির নেতারা এই জায়গা চেনেন না, এই লোকগুলোকে জানেন না। তাই সাগিনাকে সরিয়ে নিয়ে একটা ভুল করেছেন। সেই ভুল শুধরে দেব।

মিটিং শুরু হবার পর থেকেই একটা হট্টগোল চলছিল। বাড়ছিল। কোনো বিষয়েই নিজেরা একমত হতে পার আর পারছিল না বলেই রাগ চড়ছিল ওদের। খালি করছিল ওরা।

হঠাৎ সাগিনা এসে পড়ল। প্যাণ্ট কোট টাই পরা তবে ওর পোশাকের জলুস অনেক চটে গেছে। চোখমুখ দেখে মনে হলো, টেনে এসেছে বেশ। মাথার চুল এলোমেলো। বোধ হয় খব ঘুরেছে সারাদিন।

আমি ওকে দেখে ওর দিকে এগিয়ে যাবার আগেই সাগিনা বক্তাদের টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল।

ওকে দেখে হট্টগোল থেমে গেল। সভাস্থল নিশ্চুপ।

সাগিনা গলা চড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কেয়া মামলা হ্যায়, সাথীও ?'

সবাই চুপ।

'কিসকা মিটিং ?'

হঠাৎ বাহাদুর চেঁচিয়ে উঠল, 'নিকালো শালে গদ্দার। ভাগো হিঁয়াসে।'

কী সুতীব্র বিদ্বেষের জ্বালায় যে বাহাদুরের চোখ দুটো জ্বলজ্বল উঠল, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ও দুটো যেন ঘৃণার লিকলিকে

আমি শিউরে উঠলাম। এই সেই বাহাদুর। সাগিনার সব কে অনুগত অনুচর। সাগিনার কথায় আমার ঘরে একদিন একটা মেয়ে এনে হাজির করেছিল।

বাহাদুরের কথা থামতে না থামতে ঘৃণা, বিদ্বেষ চারিদিক থেকে যেন মুঠো মুঠো করে সবাই সাগিনার মুখে ছুঁড়ে মারতে লাগল। দেখলাম সাগিনা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে।

বুঝলাম, যা দেখছে তা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। ও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

ভাগো ভাগো ভাগো। শালা দালাল। কুত্তিকা বাচ্চা আব ন গিয়া হ্যায়।'

খ শালে', গুরুং কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এল সাগিনার দিকে।

'দেখ শালে, ক্যায়া হালত হুয়া হামলোগকো। না খানা না পহেননা। আউর তু বড়ে সাহাব বন গ্যয়া। শালে কো মুহমে থুক ডাল।'

থুঃ করে থুথু ছুঁড়ল গুরুং।

সাগিনা চেঁচিয়ে উঠল, 'ভাইও, সাথীও—'

তার গলা ডুবে গেল তুমুল কোলাহলে।

'মার ডাল শালাকো। পিটো।'

কে যেন চেঁচিয়ে উঠল। তারপর, মুহূর্তের মধ্যে উন্মত্ত জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। কিল ঘুঁষি লাথির উত্তাল তরঙ্গে সাগিনা খাবি খেতে লাগল। কতবার উঠতে চেষ্টা করল, কতবার চেষ্টা করল কথা বলতে। কিন্তু বৃথা। সেই প্রচণ্ড মারের বেগ ঠেলে সাগিনা না পারল মাথা তুলতে, না পারল টু শব্দ করতে।

ভয়ে আমার রক্ত শুকিয়ে উঠল যেন। ক্রোধের, ঘৃণার এমন উন্মত্ত রূপ আমি আর কখনো চোখে দেখিনি। আমি থরথর করে কাঁপছি তখন। সাগিনা হঠাৎ নিদারুণ আর্তনাদ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের ভিতর কে যেন বলে উঠল, পালাও। আমি দিগ্বিদিক হারিয়ে দিলাম দৌড়।

ভাটিখানার মালিক নাকছেদি সাগিনার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সে, আমি আর পাঁচ-সাত জন আমাদের দলের লোক নিয়ে যখন ফিরে এলাম বস্তিবাজারে, তখন রাত প্রায় নটা বেজেছে। হিমালয়ের পাদদেশের রাত, তাই মনে হচ্ছে যেন বারোটা। খোলা মাঠে চিত হয়ে পড়েছিল সাগিনা। একা। তার স্যুট টাই ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেছে। নাক-মুখ ফুলে উঠেছে। মাথা ও কপাল ফাটা। রক্ত চাপ চাপ হয়ে রয়েছে সারা গায়ে।

না মরেনি। ধরাধরি করে ভাটিখানায় এনে তোলা হলো ও দু'তিন ঘণ্টা পরে জ্ঞান হলো। উঃ আঃ কিচ্ছু করল না সাগিনা

নাকছেদি ওকে মদ খেতে দিলে। ঢক ঢক বোতল ফেলল। তারপর বসে বসে হাঁপাতে লাগল।

একটু পরে বলল, থেমে থেমে বলে চলল, 'আমাকে খুব পিটেছে। কিন্তু ঠিক করেছে। বুঝতে পারছি, বেইমা।৷ করেছি। পুরা সমঝ গিয়া হ্যায় হাম।'

'লেকিন কামরেড', আমার হাত চেপে ধরল সাগিনা। বলল, 'এক ধোঁকাবাজীতে আমি ফেঁসে গিয়েছিলাম। আমি তা বুঝতে পারিনি। হাঁ, মজদুরের ভাল করার নাম করে আমি খালি মজা করে কাটিয়েছি। খালি বান্দর নাচ নেচেছি। কি আফসোস!'

সেই সাগিনার শেষ কথা। পরদিন শুকনা ফরেস্টে তার রেলে কাটা দেহটা পাওয়া যায়। রেল লাইনের পাশেই উপুড় হয়ে পড়েছিল। কেউ বলে—সে খুন হয়েছে; কেউ বলে—আত্মহত্যা করেছে।